অনীক

ডিসেম্বর ২০১৩
বর্ষ ৫০ □ সংখ্যা ৬
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ

সুপ্রিম কোর্টের দুটি রায় ❑ সঞ্জীব আচার্য ❑ ২
বড় পার্বনের আগে... ❑ তড়িৎ চৌধুরী ❑ ৪
বহরমপুর জেলে মৃত্যু ❑ মিলন মালাকার ❑ ৬

প্রবন্ধ

মারুতি শ্রমিকদের আন্দোলন ❑ অমিত ❑ ৭
পঃবঙ্গে রাজনৈতিক বন্দি ❑ বিশ্বজিৎ রায় ❑ ১৫
যুগান্তকারী সংকট ❑ জন বেলামি ফস্টার ❑ ৩০

গ্রন্থ আলোচনা

আমি তোমারি মাটির কন্যা ❑ হৈমন্তী রায় ❑ ৩৬

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

তেড়েমেরে ডান্ডা...

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের বড়ো বাড় বাড়িয়াছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে, রাজ্যে এখন পরিবর্তন আসিয়াছে। এখন যখন তখন আন্দোলন-ডেপুটেশন চলিবে না। গত বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের সময় আমি কড়া বার্তা দিয়াছিলাম। ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য তাহাদের বেতন কাটিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম ইহাতে কর্মচারীদের শিক্ষা হইবে। কিন্তু দেখিতেছি, সবাই এক ধাতুতে গড়া নহে। আন্দোলন-সংগ্রামকে এখনও কেহ কেহ অধিকার বলিয়া মনে করে। সংবিধানে নাকি সেইরূপ লেখা আছে। উহারা জানেনা, আমার রাজ্যে আমিই সংবিধান। ‘‘মত কাকে বলে, শুন। মত তা-ই যা আমার মত’’।

দিয়াছি দুজনকে বদলি করিয়া। একজনকে দার্জিলিঙে নির্বাসন আর একজনকে হলদিয়ায়। এর আগেও কামদুনি কাণ্ডের প্রতিবাদ করিবার জন্য ইহাদের নেতাকে রাইটার্স থেকে বাহির করিয়া দিয়াছিলাম। কথা শুনে নাই, এবারে একেবারে টাইট করিয়া দিয়াছি। আইনত সচিবালয় কর্মীদের জেলাস্তরে বদলি করা যায়না। এ সমস্ত বস্তাপচা আইন আমি মানিনা। দরকার হইলে আইনটাকেই জবাই করিবো।

জানি জানি, ইহারা বাম আমলেও আন্দোলন করিয়াছে, কর্মচারীদের মহার্ঘভাতায় ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে ইহারা জ্যোতিবাবু-বুদ্ধদেব সরকারকে তুলোধোনা করিয়াছে, মানিতেছি আমার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়ও ইহারা পাশে থাকিয়াছে। তো কী হইলো? পরিবর্তনটাকে তো ভুলিলে চলিবে না। রাজ্যে পরিবর্তন হইয়াছে, আমিও পরিবর্তিত হইয়াছি। ক্ষমতায় অসিবার আগে যাহা করিয়াছি, যাহা বলিয়াছি, এখন কি তাহাই বলি? এসব দেখিয়া তো শিখিতে হইবে। না বুঝিলে ভুগিতে হইবে। সুনন্দদাকে দেখিয়া শিক্ষা হয় নাই! ৮১ বছরের বৃদ্ধ বলিয়া আমি কি ছাড়িয়া কথা কহিয়াছি?

আমার শ্রমমন্ত্রী তো বামপন্থী, ট্রেড ইউনিয়ন করা মানুষ। নয় কি? তিনি তো কতবার বলিয়াছেন সরকারি কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নাই। আইনে যে এমন কথা বলা আছে, তাহা নহে। কিন্তু একজন সিনিয়র মানুষের কথা তো মানিতে হইবে। আমার অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় ঘোষণা করিলেন, কর্মচারীদের কোনো মহার্ঘভাতা বকেয়া নাহি। অমনি উহারা ৩৮, ৩৮ করিয়া হৈচৈ বাধাইয়া দিলো। এত হৈচৈ করিবার কী আছে? আমি তো উহাদের কথা ভাবিয়া পরের দিনই ৬ পারসেন্ট ডিএ ঘোষণা করিলাম। এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ নাই? উহারা ঘরে ঘরে প্রচার শুরু করিয়া দিলো, মহার্ঘভাতা দয়ার দান নহে, উহা অধিকার। অন্য ছোটবড়ো রাজ্যগুলি যদি তাহাদের কর্মচারীদের ডিএ দিতে পারিয়া থাকে, পশ্চিমবঙ্গ পারিবে না কেন? ক্লাবগুলাকে যে টাকা দিই, তাহাতেও উহাদের চোখ টাটাইয়াছে। কেন দিবনা? উহারাই তো গণতন্ত্র রক্ষা করিতেছে। আন্দোলন করিয়া যাহারা গণতন্ত্রের বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে, ক্লাবের ছেলেরাই তো তাহাদের সহবৎ শেখাইতেছে। ওই যে কামদুনি প্রতিবাদ মঞ্চের প্রেসিডেন্ট ছেলেটি, বড্ড বাড়াবাড়ি করিতেছিল। তাহাকে তো উহারাই শিক্ষা দিয়া হাসপাতালে পাঠাইলো। আমার সোনার ছেলেদের আগে টাকা না দিয়া কর্মচারীদের মাইনে দিব? কী আবদার!

দেখুন, আমি তো শুধু কর্মচারীদের আন্দোলন করিতে বারণ করি নাই।

আমি প্রতিবাদ শব্দটাকেই অভিধান হইতে মুছিয়া দিতে চাই। "আপামর জনে আমি কহাইব আজ, আমিই গম্বুজ চূড়া আমি দেশ আমিই সমাজ"। কলকাতা শহরের আমার নিয়ন্ত্রিত হলগুলিতে আমার অনুমতি ভিন্ন কেহ কোনো সভা করিতে পারেনা। মেট্রো চ্যানেলে আমার দল ছাড়া আর কাহারও কোনো অধিকার নাই। আমার ভাগ্য ভালো, ইউএপিএ-র মতো একটা অস্ত্র হাতে পাইয়াছি। আন্দোলন করিয়াছ কী, সিডিশনে চালান করিব। সমস্যা হইতেছে, জেলখানাগুলিতে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না।

কিন্তু এত করিয়াও তো বাগ মানাইতে পারিতেছি না। আন্দোলন তো বাড়িয়াই চলিতেছে। বন্দীমুক্তির জন্য আন্দোলন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, সারদা কাণ্ডে আন্দোলন। এই আন্দোলন থেকে বাঁচিবার জন্য কলকাতা ত্যাগ করিলাম। নবান্নের উপর থেকে গঙ্গার কী শোভা দেখা যায়! কিন্তু সেখানেও আমারই কর্মচারীরা আমারই সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে শুরু করিয়াছে। নেহাৎ এখন উহারা ঐক্যবদ্ধ নহে। তাই রক্ষা। হইলে বিপদ ছিল।

নাঃ, আর ভাবিতে পারিতেছি না। গান শুনিতে হইবে। ঐ গানটা অনেকদিন শোনা হয় নাই। ঐ যে, "চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।"

ঘটনা প্রবাহ

সুপ্রিম কোর্টের দুটি রায় : আশা এবং আশঙ্কা

গত ১০ই জুলাই, ২০১৩ একটি জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেয়। এই রায়ে বলা হয় "কোনও জনপ্রতিনিধি যদি কোনও মামলার রায়ে দুবছর অথবা আরও বেশি বছরের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হন তাহলে তৎক্ষণাৎ তিনি জনপ্রতিনিধিত্ব হারাবেন।" এতদিন পর্যন্ত Representative People's Act (RPA)-এর ৮(৪) ধারা অনুযায়ী কোনও জনপ্রতিনিধি সাজাপ্রাপ্ত হলে তিনমাসের মধ্যে যদি উচ্চতর আদালতে আবেদন করতেন তাহলেই তাঁকে তাঁর জনপ্রতিনিধিত্ব হারাতে হতো না। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে সেই রক্ষাকবচ (!) হারাতে হলো।

এরপর ১১ই জুলাই এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, জেলে আটক থাকলে শুধু ভোট না দিতে পারাই নয়, ভোটেও সেই ব্যক্তি দাঁড়াতে পারবে না।

এই রায় জানার পর থেকে রাজনৈতিক দলগুলির মাথায় বজ্রাঘাত। প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দলেরই অপছন্দ এই রায়। ডান-বাম-গেরুয়া-হাত-ফুল-কাস্তে— প্রতিক্রিয়া প্রায় একই রকমের। আদালত বাড়াবাড়ি করছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার তৎক্ষণাৎ সুপ্রিম কোর্টে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে। সুপ্রিম কোর্ট ঐ রায়ই বহাল রাখে। ইউপিএ সরকার তখন আইনসভার ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাদল অধিবেশনে নতুন বিলের প্রস্তাব করে সুপ্রিম কোর্টের ঐ রায় অগ্রাহ্য করার জন্য। বিলটি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আলোচনার জন্য রয়েছে। কিন্তু এদিকে সামনেই অন্তত দুটি মামলায় সাজা পেতে চলেছেন ইউপিএ-র সমর্থক লালুপ্রসাদ যাদব এবং আরেক কংগ্রেস নেতা রশিদ মামুদ। সাজা পেলেই জনপ্রতিনিধিত্ব হারাতে হবে। সুতরাং এই যুদ্ধকালীন তৎপরতা। বাঁচাতেই হবে কেলেঙ্কারিতে যুক্ত দুর্নীতিগ্রস্ত দুই সহযাত্রীকে। বিলের জন্য অপেক্ষা না করে অর্ডিন্যান্স তৈরি করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেয় সম্মতির জন্য। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের এই উদ্যোগকে কোনও রাজনৈতিক দলই বিরোধিতা করে নি। সকলেরই স্বার্থ এক তরীতে। আইন-বিশেষজ্ঞরা রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রের এই উদ্যোগ সম্পর্কে সদর্থক কোনও মতামত দেন নি। রাষ্ট্রপতিও দ্বিধাগ্রস্ত। এমন সময়ে হঠাৎ যুবরাজের ঘুম ভাঙলো। প্রকাশ্যে তিনি বললেন, 'এই অর্ডিনান্স ছিঁড়ে ফেলা উচিত'— নিষ্পাপ বিপ্লব। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত। সোনিয়া-রাহুল চাইলে তো তখনই আটকোনো যেত। কিন্তু তাতে যুবরাজের দুর্নীতি-বিরোধী ভাবমূর্তিতে রঙ চড়ানো যেত না। যাই হোক, কংগ্রেস দল যে এখনও নেহরু পরিবারেরই দাসসমষ্টি তা প্রমাণ করে অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করে নিলো। বিজেপির গোঁসা হলো। রাহুলের একটু হলেও টিআরপি বাড়লো তো।

কিন্তু অর্ডিনান্স নিয়ে কংগ্রেসের উদ্যোগটাই ঠিক হয় নি, এ কথা কোনও দলই বললো না। কেন? শুধুমাত্র বর্তমান সাংসদ ও বিধায়কদের মামলা সংক্রান্ত তথ্য দেখলেই আর এই প্রশ্ন থাকবে না।

বর্তমানে ৩০ শতাংশ সাংসদ এবং ৩১ শতাংশ বিধায়কদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কিংবা আর্থিক দুর্নীতির মামলা আছে। সাংসদ এবং বিধায়ক মিলিয়ে এরকম অভিযুক্তের সংখ্যা ৪৮০৭ জন— কংগ্রেসের ২১ শতাংশ ও বিজেপির ৩১ শতাংশ মন্ত্রী-বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার ৮২ শতাংশ, বিহারের আরজেডির ৬৪ শতাংশ জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা চলছে। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির মুখ্যমন্ত্রীসহ ৪৮ শতাংশই দুর্নীতির অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গেও নেতাদের দুর্নীতি কিছু কম নয়। সারদা কেলেঙ্কারিতে সিপিএম-তৃণমূল পরস্পর দোষারোপ করলেও সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, কেউই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। বামফ্রন্ট আমলে এই সব চিটফান্ড মানুষ ঠকানো ব্যবসা শুরু করে। বেআইনি জেনেও বামফ্রন্ট সরকার

কোনও পদক্ষেপ তো নেয়ই নি বরং চিটফান্ডের থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করেছে। আর তৃণমূল দল বামফ্রন্টের এই দুর্নীতিগ্রস্ত পদক্ষেপকে বিরোধিতা করার পরিবর্তে চিটফান্ডের সঙ্গে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছে। তৃণমূলেরই সাংসদ কুনাল ঘোষের বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার থেকে এটা পরিষ্কার যে তৃণমূল দলের মাথা থেকে পা পর্যন্ত অনেকেই সারদার সুবিধা নিয়েছে। আর প্রতারিত জনগণকে কিছুটা টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নয়। যারা টাকা পেয়েছে তাদের থেকে আদায় করে নয়। এই দুর্নীতিও আমরা মেনে নিয়েছি।

গত দশকে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চালচিত্র গরিব মানুষের বাঁচার পক্ষে ক্রমশ কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। আকাশ-ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, কর্ম সংকোচন, বেকারত্ব বৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রায় পণ্যে পরিণত। সরকারি ভরতুকি শিল্পপতিদের জন্য বেড়েছে, গরিব মানুষের জন্য ভরতুকি প্রায় তলানিতে। কিন্তু না, এর কোনওটাই খবরের কাগজে খবর হওয়ার মতো গুরুত্ব পায় নি। খবরের কাগজে রাজনীতির খবর মানেই শুধু দুর্নীতির খবর। ডেথ সার্টিফিকেট দেওযার জন্য ঘুষ নেওয়ার খবর থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর কয়লা ব্লক বন্টনের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার। টু-জি, থ্রি-জি, সারদা— এক একটা লোমহর্ষক কেলেঙ্কারি, মূলত রাজনৈতিক নেতাদের মদতে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হওয়া যে ক্ষমতালাভের জন্য এটা জানাই ছিলো, আর ক্ষমতার সাথে যুক্ত মানেই দুর্নীতি করেও পার পেয়ে যাওয়াটাই রীতি— তাই দুর্নীতিহীন রাজনৈতিক নেতা ক্রমশ বিলুপ্ত প্রজাতি। সাধারণ মানুষের এটাই উপলব্ধি, বিশ্বাস। 'রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে আছে অথচ কোনওরকম দুর্নীতির সাথে যুক্ত নয়'— এটা বর্তমানে বিশ্বাস করাই মুশকিল। কাউন্সিলাররা বাড়ির নকশা অনুমোদনে ঘুষ চাইবে। মন্ত্রীরা বেসরকারি সংস্থাকে নামমাত্র মূল্যে কয়লা ব্লক পাইয়ে দেবে। এতে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা। টু-থ্রি-জি-তে সরকারের ক্ষতি ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা। সারদা চিটফান্ডে সাধারণ মানুষের ক্ষতি কয়েক হাজার কোটি টাকা। এর প্রত্যেকটাতেই রাজনৈতিক কেষ্ট-বিষ্টুরাই যুক্ত। একদিকে টাকা যোগাড় করতে না পেরে বিনা চিকিৎসার নিজের সন্তানকে মরতে দেখা সাধারণ মানুষ আর অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে যুক্ত রাজনৈতিক নেতা। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে প্রাথমিকভাবে সাধারণ মানুষ সমর্থন করছে। রাজনৈতিক নেতাদের আধিপত্যে অন্তত কিছুটা কোপ পড়বে— এই আশায় তারা খুশি। অনেকে আবার মনে করছেন, এই রায়ে কলুষিত গণতন্ত্রের শাপমুক্তি ঘটবে। রাজনীতি দুর্নীতি ও অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু সত্যি কি তাই?

আইন তৈরি হওয়া আর আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করার মধ্যে ব্যবধান অতলান্তিক। আইন প্রয়োগ হবে রাজনৈতিক নেতাদের মর্জিমাফিক, স্বার্থমাফিক। যে পরিমাণ দুর্নীতির সাথে রাজনৈতিক নেতারা যুক্ত তার কতটা অভিযোগ হিসাবে নথিভুক্ত হয়, কতটার শাস্তি ঘোষিত হয়? মামলার তদন্ত করবে পুলিশ কিংবা সিবিআই যারা শাসক দলের বশংবদ, বিশ্বস্ততম, আজ্ঞাবহ— ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত মরুদ্যানের চেয়েও দুষ্প্রাপ্য। আজ পর্যন্ত কজন মন্ত্রী, এমএলএ, এমপি-র সাজা হয়েছে? সারদা কাণ্ডে কুণাল ঘোষকে গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ— কিন্তু বাকি নেতারা বাদ যায় কেন? এই কুণাল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিতেন— তাই এতদিন গ্রেপ্তার হন নি। কিন্তু কুণাল ঘোষ যাদের নাম বললেন তাদের পুলিশ ছোঁবে? সারদা কাণ্ডে অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরমের স্ত্রীর নামেও অভিযোগ উঠেছিলো— সিবিআই-ও তাকে ধরবে না। কয়লা কেলেঙ্কারিতে প্রধানমন্ত্রীর যোগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সচিব বলেছেন (নিজে গ্রেপ্তার হওয়ার পর), প্রধানমন্ত্রীকে সিবিআই প্রশ্ন করবে। যদি ভুল করে রিপোর্টে কোনও উল্লেখও থাকে— আরেক মন্ত্রী দায়িত্ব নিয়ে রিপোর্ট বদলে দেবে। কিছু চুনোপুঁটি সাজা পাবে। দৃষ্টান্ত তৈরি হবে। গণতন্ত্রের ধ্বসে যাওয়ার ভাবমূর্তিতে একটু প্রলেপ। আসল পাণ্ডারা অধরাই থেকে যাবে।

ভারতবর্ষে 'আইন' অপরাধীকে সাজা দেয় বা অপরাধ থেকে নিরস্ত করে যে মাত্রায়, তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় প্রযুক্ত হয় বেয়াড়াকে সোজা করার জন্য, আইনভঙ্গকারীকে ভয় দেখিয়ে ঘুষ নেওয়ার জন্য, জনগণকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চাপে রাখার জন্য এবং বিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য। আশঙ্কা তাই থেকেই যায় সুপ্রিম কোর্টের এই রায় অপপ্রয়োগের নতুন হাতিয়ার হয়ে যাবে কিনা। জেলে পুরে দিতে পারলেই ভোটে লড়া বন্ধ করে দেওয়ার সুযোগ শাসকদলের হাতে। শাসকদলের সংস্কৃতি যা, তাতে এর অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা প্রবল। দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপরাধীদের রাজনৈতিক আঙ্গিনায় ঠাঁই না দেওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে এই রায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে রাজনীতিই তো অপরাধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত তৈরি করার সবচেয়ে বড় উৎস হিসাবে কাজ করছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার জ্বলন্ত প্রমাণ। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর দুর্নীতির সাথে গাঁটছড়া বাঁধছেন অধিকাংশই। 'ডিম' আগে না মুর্গি-র মতো প্রশ্ন— দুর্নীতিগ্রস্তরা রাজনীতিকে কলুষিত করছে, নাকি বর্তমান রাজনীতির গহ্বরেই রয়েছে দুর্নীতির ভাইরাস? শিকার না উৎস? বর্তমান সময়ের ভোগবাদ, নীতিহীন পণ্য সার্বিকতা ক্ষমতাধর মানুষকে পাঁকে টেনে নামাবেই। রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ক্ষমতা থাকায় তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। হচ্ছেও তাই। গৃহবধূ কাউন্সিলর হওয়ার দুদিনের মধ্যেই প্রমোটারদের সাথে গোপন বৈঠক করছেন। নীতিবাগীশ বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক

ক্ষমতার ছোঁয়ায় প্রমোদে ভাসছেন। তাই এই রায় সদর্থক হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিকে কতটা দুর্নীতিমুক্ত করবে তা প্রশ্নাতীত নয়। হয়তো বেলচা দিয়ে হিমালয় পরিষ্কার করার মতোই!

আইনে সাজা হলে তবে এই রায় প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আইন বদল করে নিয়ে দুর্নীতিটাকেই আইনগ্রাহ্য করে নিচ্ছে যারা, তাদের কীভাবে আটকানো যাবে? আইনটাকে বদলে নিয়ে দেশের কোটি কোটি টাকার খনিজ ও জমি বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে যারা, তারা তো ধরাছোঁয়ার বাইরে। দেশের কোটি মানুষকে বেকার করে দিয়ে খুচরো বিক্রেতার বাজার তুলে দিচ্ছে ওয়ালমার্টের হাতে। এই অপরাধ কি বিহারের একজন বাহুবলীর ত্রাসের থেকে কম? কিন্তু একে ছোঁয়া যাবে না— উন্নয়নের নাম করে, জমি-খনি বাজার-ব্যবসা বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার প্রত্যেকটি প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। দল পাচ্ছে, নেতা পাচ্ছে। বশে রাখার জন্য ভাগ চলে যাচ্ছে নিচের তলায়, আইন বদল করে আইনি মোড়কে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাংসদ হাতে থাকলে পুরো দেশটাকে বেচে দেওয়ার আইন বানাতে অসুবিধা কোথায়?

তবে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আশঙ্কা ও প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। বহু মানুষ আশা করছেন এই রায়ের পর রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী বাছাই প্রশ্নে সতর্ক হবে। দলগুলি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও গণ-দাবিগুলি মাথায় রাখতে বাধ্য হবে যা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ।

আরেকটি রায় 'নোটা' বা 'কাউকে পছন্দ নয়' ভোট নিয়ে। এটা স্বীকার্য যে, এই রায়ের ফলে ভোটাররা তাদের প্রয়োজনীয় একটি অধিকার লাভ করলো। ভোট দিতে ইচ্ছুক অথচ দেওয়ার মতো কাউকে পাচ্ছে না— এমন যারা তাদের জন্য নতুন একটা পথ খোলা রইলো। নিঃসন্দেহে এটা একধাপ এগোনো। কিন্তু তারপর? বহু মানুষ্যও যদি 'কাউকে ভোট নয়' এই মত দেন— তারপর কী হবে সে বিষয়ে এই রায় বা অন্য কোথাও কিছু বলা নেই। তাই এই রায়ের পরেও মুক্ত, জনমুখী গণতন্ত্র কি আদৌ পাওয়া যাবে?

আমাদের দেশে নির্বাচনে সাধারণ মানুষ কতটুকু স্বাধীনভাবে পছন্দমতো ভোট দিতে পারে? রিগিং, সন্ত্রাস, টাকার থলি, জাতপাত-ধর্ম— বহুবিধ পাকেচক্রে ভোটদান আর মতদান সমার্থক নয়। তাছাড়া যতক্ষণ না পর্যন্ত 'কাউকেই ভোট নয়'— এই মতের কোনও কার্যকর প্রভাব বা পদক্ষেপ নির্ধারিত হচ্ছে অনেকেই এই মতদানকে 'ভোট নষ্ট' বলে মনে করবে।

আর ভিতর থেকেই ঘুণধরা এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলিও অপরাপর দলগুলির মান সম্পর্কে এমনই নিশ্চিত যে তারা নিজেকে বদল করবার কোনও প্রয়োজনই বোধ করবে না।

তাই এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ রায় মানুষের জন্য গণতন্ত্রকে কতটা দূষণমুক্ত করবে তা বলা শক্ত। বর্তমান সময়ে এই গণতন্ত্র সম্পর্কে মানুষ বীতশ্রদ্ধ। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে হতাশ। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির শাসন এবং দুর্নীতির অধিকারেরই কেবল পুনর্বিন্যাস ঘটে— জনগণের অধিকার একইরকম অধরা থেকে যায়। তাই রাষ্ট্রের আশঙ্কা থেকে যায় যে মানুষ সমগ্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। তাই গণতন্ত্রে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা। বীতশ্রদ্ধ ভোট বয়কটকারীদের একাংশকে ভোটের আঙিনায় টেনে আনার চেষ্টা। রাজনৈতিক দলগুলিকে 'না' বলুক, কিন্তু 'রাষ্ট্র'কে নয়, এই 'গণতন্ত্র' কে নয়।

সঞ্জীব আচার্য

বড় পার্বনের আগে ছোট পার্বণ

পাঁচটি রাজ্যের ভোট বা জনাদেশের ফলাফল জানা গেল। অধীর আগ্রহের সাথে দেশের সবাই— আমজনতা, ব্যবসায়ীমহল, শিল্পপতিদের লবি এবং কোটি কোটি টাকার মালিক বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা অপেক্ষা করছিল ফলের জন্য। কেননা হাজার হাজার কোটি টাকার এই পার্বণ আসলে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেরই ট্রায়াল গেম! সেই আসল পার্বণের দিকে নজর রেখে এই সব রাজনৈতিক দল, সে আঞ্চলিক হোক কিংবা জাতীয় হোক, সবাই ভোটযুদ্ধে নেমে পড়েছিল, যাতে বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী না দেওয়া হয়।

এবং ভোটযুদ্ধ হলো নির্বিঘ্নে, যদিও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ২০ শতাংশ বেড়ে আকাশ-ছোঁওয়া, যদিও পেঁয়াজের দাম বেড়েছিল পাঁচগুণ, যদিও মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ১৯৮৪ সালের গ্যাস দুর্ঘটনার ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা ছিল পাঁচ লাখ এবং বর্তমান প্রজন্ম প্রায়শই বিকলাঙ্গ এবং দোষীরা শাস্তির আওতার বাইরে। তবু ভোট হলো জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের। গত ৯ ডিসেম্বর চারটি রাজ্যের ফলাফল প্রকাশিত হবার পর জানা গেল যে হিন্দী বলয়ের এই রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস দল কার্যত মুছে গেছে ক্ষমতার অলিন্দ থেকে। রাজস্থানকে নতুন করে দখল করে নিল বিজেপি। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের কোন আশা ছিল না। কংগ্রেস নেত্রীর জন্মদিনের ২৪ ঘণ্টা আগেই চার রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয় হল শোচনীয়। যদিও কংগ্রেস দল সভানেত্রীর ছেলে রাহুলকে ভোটের প্রচারে নামিয়েছিল এবং অনেক কষ্ট করে তিনি বুন্দেলখন্ডে প্রচারে গিয়ে মশার কামড় খাবার কথা ও পানীয় জলের দূষণের কথা বলেছিলেন, তবু ভোটারদের মন তো ভেজে নি। বিজেপি-র মোদী বনাম রাহুলের ভোটযুদ্ধের প্রচারবাণী শুনেছে সবাই। কিন্তু ছাপ মেরেছে কার কাছে কী কী পাওয়া যাবে এই হিসাব করে।

রাহুল প্রশ্ন তুলেছিল মধ্যপ্রদেশে শিশুমৃত্যু হার গত পাঁচ বছরে লক্ষাধিক। মোদীর উত্তর ছিল গমের বস্তা পচছে সরকারি গোডাউনে, তবু আমজনতা খাবার পায় না। সমীক্ষা মতোই মধ্যপ্রদেশে ৪৪.৯ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি ১৬৫টি আসনে

জিতে ক্ষমতায় এলো। ২০০৮ সালে তাদের জেতা আসনের সংখ্যা ছিল ১৪৩টি। তৃতীয়বারের জন্য শিবরাজ চৌহান ক্ষমতা দখলে রাখলেন জনপ্রিয় কিছু কর্মসূচি নেওয়ায়, মূলত মহিলাদের নিয়ে। তিনি ঐ রাজ্যে প্রতিটি মেয়ের জন্মের সাথে সাথে 'লাখপতি' বনার সুযোগ দিতে ২১ বছরের স্কিম 'লড়কি লক্ষী যোজনা' চালু করেছেন, যাতে উপকৃতের সংখ্যা ১৫ লাখ। ফলে প্রায় অনেক পরিবারের মুখে হাসি। তাছাড়া আছে 'কন্যাদান' ও 'গাঁও কী বেটি'-র স্কিম, যাতে প্রতিটি ছাত্রী বাইসাইকেল পাবে। তা সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশের ১০ জন মন্ত্রী তাদের পদ খুইয়েছেন।

রাজস্থানে রাজপরিবার সিন্ধিয়ার মেয়ের কাছে কংগ্রেসের অশোক গেহলট হার স্বীকার করলেন মোদীর গেরুয়া ঝড়ে। বিজেপি গত বারের তুলনায় ৮৪টা আসন বেশি দখল করে মোট ১৯৯টি আসনের মধ্যে ১৬২টি আসনের দখল নিল। গেহলট ২০১১ সালে বিনে পয়সায় ওষুধ দেবার স্কিম চালু চালু করলেও ভোটাররা কংগ্রেসের দুর্নীতি আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মানতে চায় নি। ফলত মোদীর প্রচার সফল। ভোট এলো রাজপরিবারের ঘরে, মেয়ের হাত ধরে। বসুন্ধরা রাজের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি কাজে লাগল।

ছত্তিশগড় নিয়ে আশা ছিল কংগ্রেসের। কেননা আইন শৃঙ্খলার সমস্যা বা বিজেপি দলের দুর্নীতি ভরপুর এই রাজ্যে। কিন্তু ৯০টি আসনের এই রাজ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কথা ভাবলেও বিজেপি-র মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং গতবারের ৪৯টি আসন থেকে হারিয়েছেন মাত্র ১টি আসন, আর কংগ্রেসের আসন বেড়ে হয়েছে ৩৯টি। অনেকেই ভেবেছিলেন, গত মে মাসের বস্তারের হত্যাকাণ্ড, যাতে ঐ রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা নিহত হয়েছিল, সেই ঘটনা ভোটে ছাপ ফেলবে। কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডে ২৮ জন কংগ্রেস নেতা নিহত হলেও বস্তারের ১২টি আসনে কংগ্রেস পেল ৮টি। এই অঞ্চলে মাওবাদীদের ভোট বয়কটের ডাক থাকলেও ভোট পড়েছে। এই রাজ্যেই অ্যান্টি-নকশাল স্কিমের অন্যতম হোতা কংগ্রেসের কর্মা পরিচালিত 'সালওয়া জুদুম' নামের আদিবাসীদের উপর অত্যাচারের নয়া কর্মকাণ্ডে রমন মন্ত্রীসভার অনুমোদন ছিল। মাওবাদীরা 'সালওয়া জুদুম'-এর অত্যাচারের কর্মসূচিকে বন্ধ করতেই এই হত্যাকাণ্ড চালায়। ফলে কংগ্রেসের দলীয় অবস্থানের ভিত নড়ে যায় এবং তার সুযোগ নেয় 'শনিবারের ডাক্তার' রমন সিং। এক সময়ের আয়ুর্বেদ ডাক্তার রমন সিং তার রাজ্যে 'ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০১২' চালু করেছেন। ফলে নাম হয়েছে 'চালওয়ালা বাবা'। দরিদ্র আদিবাসীদের কাছে দুটাকার চাল, অর্থাৎ দুবেলা পেট ভরে খাওয়াটা স্বপ্ন পূরণ। তারপর তো মানব অধিকার।

কিন্তু সব কটি রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ভোট ছিল দিল্লীতে, যা যাবতীয় ভোটের অঙ্ককে পাল্টে দিয়েছে। মাত্র ৯ মাস আগে তৈরি হওয়া 'আম আদমী পার্টি' ঝাঁটা হাতে দীর্ঘ ১৫ বছরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেসকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করল। ২ বছর আগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্না হাজারের দিল্লীর যন্তরমন্তরের অনশন মঞ্চ থেকেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হাত ধরে আম আদমী পার্টির জন্ম। ১৯৮৯ সালের আইআইটি খড়গপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ। উচ্চপদস্থ আমলার চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে আসা এই শিক্ষিত যুবক দিল্লীর মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মাঝে 'দুর্নীতি হটাও'-এর স্লোগান তুলে বাজিমাৎ করেছেন। ম্যাগসাইসাই পুরস্কার প্রাপ্ত রাজনীতিহীন রাজনীতির মানুষ দিল্লীর আমজনতার হৃদয় জয় করে ২৮টি আসন নিয়ে যেমন কংগ্রেসের চিহ্ন প্রায় মুছে দিয়েছেন, তেমনি গেরুয়াঝড়কেও আটকাতে পেরেছেন। ফলে বিজেপি ৩১ আসন পেয়েও ক্ষমতার দখল নিতে নারাজ। চলতি রাজনীতির কাঠামো-বিহীন 'ইন্ডিয়া'র এই পার্টি কি নয়া দিল্লীর রাজপথ ছেড়ে ভারতের গ্রামেগঞ্জে আসতে পারবে? জনগণের ভাগ্য-নির্ধারকরা জানেন, ক্ষমতায় আসতে হলে চাই গ্রামেরই গরিব মানুষের ভোট। তাদের মধ্যে টাকা-মদ-জামা-শাড়ি ওড়ালে বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয় জিইয়ে রাখলে কত লাভ! সেটা তো আম-আদমী-পার্টি পারবে না। এক বিশ্লেষক বলেছেন, আম আদমী পার্টি দেখিয়ে দিল ব্যালটের শক্তি মাওবাদীদের বুলেটের শক্তির চেয়ে বেশি। সত্যি কি তাই? মনে রাখা ভাল যে 'আম আদমী'র লোকেরা ভুলেও একবারও রাষ্ট্রীয় হিংসা বা কোনও অগণতান্ত্রিক আইনের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি।

বাকি থাকে মিজোরাম। সবার শেষে ফলাফল ঘোষণায় কংগ্রেসের পতাকা টিকে থাকলো মিজোরামের চারবারের মুখ্যমন্ত্রী লালথানহাওলার মাধ্যমে। এই রাজ্যে ভোটারদের সংখ্যায় মহিলাদের হার বেশি হলেও পদ মাত্র ৩টি। রাজ্যের রিপোর্ট অনুযায়ী এইচআইভি আক্রান্তদের সংখ্যা এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি হলেও জনমোহনী কর্মসূচি নিয়ে পঞ্চমবার রাজত্ব জয় করলেন লালথানহাওলা।

যদিও আগামী বড় পার্বনের দিকে তাকিয়ে রইল কংগ্রেস। কিংবা বিজেপি। মোদীর মুখ কি আগামীদিনে ম্যাজিক দেখাতে পারবে?

এই ভোটের খেলায় পরিষ্কার যে বড় দলগুলি যাদের অর্থের থলি বড় তারাই রথযাত্রা শান্তিযাত্রা ইত্যাদি ভোটযাত্রা করতে পারবে ভোট টানতে। আঞ্চলিক দলের সমর্থন পেতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লী যাত্রা ফেডারাল স্ট্রাকচার গঠন জোরদার করবে কিনা তা দেখার অপেক্ষা। যদিও জনগণের সুবিধা কতটুকু মিলবে সেই বিকেন্দ্রিক ক্ষমতার ব্যবস্থায়, তা নিয়ে কি কোন দল ভাববে?

তড়িৎ চৌধুরী

বহরমপুর জেলে আবার মৃত্যু

হরিহরপাড়া থানা দপ্তর চোঁয়া-য় অবস্থিত। বামফ্রন্ট জমানায় আদর্শ থানার তকমা পাওয়া এই থানাতেই এক সময় রাজত্ব করেছিলেন কুখ্যাত বড়বাবু ধ্রুব ব্যানার্জী এবং পরবর্তীতে মেজোবাবু হিসাবে মানস মাইতি। মানসবাবুর বিরুদ্ধে বিবিধ বে-আইনি কার্যকলাপ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগ জানায় এপিডিআর-এর প্রয়াত সরিফুল ইসলাম। তার পুরস্কার স্বরূপ মাইতিবাবুর কাছ থেকে গোটা শরীরে বিশেষত পায়ের পাতায় সরিফুল যে আদর পেয়েছিলেন তার জেরে তিনি আমৃত্যু পায়ের পাতা পেতে হাঁটতে পারেননি। আদালতে নালিশ জানিয়ে সরিফুল দশ বছর ধরে শুধু নতুন নতুন তারিখ পেয়েছেন আর আদালতে সমন পেয়েও হাজিরা না দেওয়ার জন্য মানস পেয়েছিলেন বার তিনেক অকার্যকর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। সেই চোঁয়া তথা হরিহরপাড়া থানার অধীন চোঁয়া গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিলবারি গ্রামের এক ছোট কৃষক পরিবারের সন্তান রফিকুল সেখ বাবা নমাজি সেখের সঙ্গে জমিতে খাটতেন, চাষ দেখা-শোনা করতেন, স্ত্রী আর বছর পাঁচেকের ছেলেকে নিয়ে, মা-বাবা-ভাইদের নিয়ে আর পাঁচ জনের মতোই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন। পঁচিশ বছরের জীবনে মনে রাখার মতো কোন ঝামেলায় কোন দিন কারো সঙ্গে জড়াননি। হঠাৎ উত্তেজনাবশে প্রতিবেশীর এক ছয় বছরের ছেলেকে কাঠের মুগুর দিয়ে আঘাত করলে বালকটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। নমাজি সেখ ও এই প্রতিবেদককে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা এলাকার মহিলারা বললেন, সেই সময় রফিকুলের 'ব্রেন-টাল' (মানসিক ভারসাম্যহীন) ছিল। খুনের অপরাধে বছর পাঁচেক আগে রফিকুলের সাজা হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। স্ত্রী আইনি পথে বিয়ে থেকে ছাড় নিয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করে চলে যান। শিশুপুত্র দাদু-দিদার কাছেই মানুষ হচ্ছে, লেখাপড়া করছে। ইতিমধ্যে রফিকুলের পাগলামো চিকিৎসা করে সেরে গিয়েছে।

বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রফিকুলকে সাফাই কর্মীর কাজ দেওয়া হয়েছিল। মা প্রায় প্রত্যেক মাসেই বহরমপুর 'জেলে' গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছেন এবং রফিকুল তাঁকে বলেছেন যে তিনি ভালো আছেন। কোন অবসাদগ্রস্ততার লক্ষ্মণ দেখা যায়নি। হঠাৎ গত ২০.১১.২০১৩ সকালের দিকে থানা থেকে দুজন লোক নমাজি সেখের বাড়িতে গিয়ে জানান যে রফিকুল আগের দিন জেলের মধ্যে এক উঁচু গাছ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে সেদিন সকালে হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। অবশ্য তারা ছেলের নাম বলেছিল 'সফিকুল'। নমাজি নিজে বহরমপুরে এসে ছেলের মৃতদেহ দেখেছেন, ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ গ্রামে নিয়ে মাটি দিয়েছেন। তিনি এবং বাড়ির মহিলারা বললেন, গোটা শরীরে মারের চিহ্ন ছিল, বাঁ-পায়ের জানুতে ভারি কিছু দিয়ে জোরে মারার জন্য গভীর কালশিটে পড়েছিল। মাথার পিছন দিকে একাংশ কেউ যেন খুবলে নিয়েছিল, সেখান থেকে ভীষণ রক্তপাত হয়েছে। সামনের কটা দাঁত ভাঙ্গা। নমাজি আরো জানালেন তাঁর ত্রিশ বছরের জোয়ান ছেলের গলায় জুতোর ফিতের মতো সরু ও ছোট একটা দড়ি কষে বাঁধা ছিল যেটা হাসপাতালের আরো অনেকেই দেখেছেন। স্বভাবতই আত্মীয়-স্বজন সকলেই মনে করছেন, তাঁদের ছেলেকে খুন করা হয়েছে এবং মেরেছে 'মেটরা' (ওয়ার্ডার)। তবে অজ্ঞতাবশত তাঁরা পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ লিপিবদ্ধ করাননি।

এপিডিআর বহরমপুর শাখার দু'জন প্রতিনিধি খবর পেয়ে গত ২২-১১-২০১৩ তারিখে সংশোধনাগারের জেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাইলে তিনি মাত্র একজনকে অনুমতি দেন প্রথম গেট পেরিয়ে তাঁর দপ্তরে ঢোকার। সম্পাদক রাহুল সচিত্র ভোটার পরিচয়-পত্র দেখিয়ে ভিতরে ঢোকেন। যে গাছের ডাল থেকে রফিকুল 'আত্মহত্যা' করেছেন বলা হয়েছে সেটি রাহুলকে দেখতে দেওয়া হয়নি। তবে জেলার বলেছেন, গাছটা বেশ উঁচু এবং দুজন ওয়ার্ডার দেহটাকে ঝুলতে দেখে নামিয়ে আনলে দেখা যায় যে দেহটা 'অসংযত' ছিল (এই 'অসংযত' শব্দটা তিনি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন সাক্ষাৎকারে)। ময়না-তদন্তের ভিডিও রেকর্ডিং হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি জানিয়েছেন, আইন অনুযায়ী যা যা করার সবই করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে না গেলেও মৃতদেহ দেখেছেন এবং পোস্ট-মর্টেম ও ম্যাজিস্ট্রেট-ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট তাঁর কাছে এসে পৌঁছায়নি। তিনি জানিয়েছেন, বন্দিজীবনে রফিকুলের বিরুদ্ধে কোন উচ্ছৃঙ্খল ঘটনার কোন অভিযোগ নাই। 'আত্মহত্যা'র কারণ কী হতে পারে জানতে চাইলে তাঁর কাছ থেকে রাহুল কোন উত্তর পাননি।

এর আগে ঠিক ছয় বছর আগে (২২.১১.২০০৭ তারিখে) দুপুর বেলায় মাওবাদী সন্দেহে ধৃত বড়ঞা থানার বিছুর গ্রামের অজয় বাগ্দি সেই গাছে উঠে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বলে কারা-কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন। প্রশাসনের বক্তব্য এপিডিআর বহরমপুর শাখা মেনে নিতে পারেনি। অজয়ের দেহ তাঁদের দেখতে দেওয়া হয়নি এবং তাঁর অক্ষর পরিচয়হীন প্রৌঢ় বাবার কাছ থেকে সাদা কাগজে টিপ সই নিয়ে দেহ তাড়াতাড়ি সৎকারের ব্যবস্থা করেছিল।

এছাড়া কার্যত বিনা চিকিৎসায় বহরমপুর জেলেই মারা গিয়েছিলেন ২২.০১.২০০২ তারিখে নওদা থানার কামাদপুর গ্রামের মাওবাদী কর্মী তুরাবুদ্দিন শেখ ওরফে সদর সেখ, ২২.১০.২০০২ তারিখে ডোমকল থানার পানিপিয়া গ্রামের কংগ্রেস সমর্থক সিরাজুল সেখ, ২৫.১২.২০০২ তারিখে ইসলামপুর থানার হেরমপুর গ্রামের কংগ্রেস কর্মী লালু সেখ, ০১.০৮.২০০৪ তারিখে জলঙ্গী থানার প্রাক্তন জওয়ান সহদেব সাহা প্রমুখ।

এর পর ১৪ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

গুরগাঁও-মানেসর শিল্পাঞ্চল সহ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে

মারুতি শ্রমিকদের আন্দোলন : একটি পর্যালোচনা

অমিত

সাম্প্রতিককালের ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গত আড়াই বছর ধরে চলমান মানেসর মারুতি সুজুকির শ্রমিকদের আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। নানা চড়াই-উৎরাই এর মধ্যে দিয়ে চলা মারুতি ম্যানেজমেন্ট আর সরকার-প্রশাসনের সম্মিলিত শক্তির মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এত দীর্ঘ এই আন্দোলনে স্থায়ী-ট্রেনি-ঠিকা নির্বিশেষে শ্রমিকরা একজোট হয়ে স্বাধীন ইউনিয়ন গঠনের দাবিতে ধর্মঘট করেছে, কারখানা দখল করে উৎপাদন বন্ধ করে ভিতরে বসে গেছে, কারখানা গেটের বাইরে অবস্থান চালিয়েছে, আন্দোলনের সমর্থনে এলাকার অন্য কারখানাতেও ফ্যাক্টরি কব্জা করে ধর্মঘট হয়েছে, ইউনিয়ন নেতৃত্বকে ম্যানেজমেন্ট প্রথম দফায় জোর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার পর পুনরায় শ্রমিকরা ইউনিয়ন গঠন করেছে, কারখার ভিতরে হাজার সংখ্যায় শ্রমিক একসাথে অভূতপূর্ণভাবে ম্যানেজমেন্ট আর বাউন্সার-এর সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে, আজ অবধি পুরো ইউনিয়ন বডি সহ দেড়শ শ্রমিক জেলে ও আরো ৬৬ জন শ্রমিক পলাতক থাকা সত্ত্বেও এবং ৫৪৬ নিয়মিত শ্রমিক সহ প্রায় ২৫০০ শ্রমিক কাজ থেকে গত দেড় বছর ধরে বরখাস্ত হওয়ার পরেও শ্রমিকরা আবার প্রভিশনাল কমিটি গঠন করে বারবার ১৪৪ ধারা, পুলিশি লাঠিচার্জ, মিথ্যা মামলা, জেল অগ্রাহ্য করে ম্যানেজমেন্ট-সরকার-প্রশাসনের সাথে টক্কর নিয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন যেমন সেজ-নীতি, জমি অধিগ্রহণ আর সর্বোপরি উন্নয়ন ও বিকাশের চাপিয়ে দেওয়া মডেলের সন্ত্রাসের স্বরূপ নিয়ে সমাজে জীবন্ত বিতর্ক জন্ম দিয়েছিল, মারুতির আন্দোলনও ব্র্যান্ড মনমোহন বা ব্র্যান্ড মোদীর উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ আর কোম্পানিদের হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফার আড়ালে পুঁজির নতুন নিয়োগ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ওপর শোষণ-দমন, শ্রম-প্রক্রিয়ায় অত্যধিক কাজের বোঝা, কাজের নিরাপত্তাহীনতা, ঠিকাপ্রথা, শ্রম আইন আর অধিকারের ক্রমাগত উল্লঙ্ঘন, প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন তন্ত্রের নখদন্তহীনতা আর সর্বোপরি গুরগাঁও-মানেসারের মতো শিল্পক্ষেত্রে বিকাশ মডেলের 'প্রদীপের' নিচে জমতে থাকা কুৎসিত অন্ধকার আর শোষণ-শাসনের কাঠামোটার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের রাগ-ঘৃণাকে জাতীয় মিডিয়ার 'ব্ল্যাকআউট' সত্ত্বেও সমাজের সামনে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু 'শোষিত শ্রমিক' কিংবা 'মানবাধিকার' মারুতি আন্দোলনের আসল 'ট্যাগলাইন' নয়, আমাদের এই লেখারও মূল আলোচ্য বিষয় নয়, বরং মারুতির ভূতপূর্ব চেয়ারপার্সন এবং ২০১০ সালে প্রকাশিত 'The Maruti Story : How a public Sector Company Put India on Wheel' নামক নিজের-পিঠ-নিজে-চাপড়ানো বইটির রচয়িতা আর সি ভার্গব ২০১২ সালের ১৮ই জুলাই-এর ঘটনার পর হতভম্ব হয়ে 'শ্রেণীসংঘর্ষ' বলে যে সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন, সেই সত্যটি এই লেখার মূল আলোচ্য। তারই নতুন জমি, সমস্যা-সম্ভাবনার বিষয়টি গুরগাঁও-মানেসর-এর মতো পুঁজির নতুন নিয়োগ ক্ষেত্রে মারুতির মতো কারখানায় শ্রমিকদের শোষণ-দমনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায় নতুন প্রয়োগ, রূপ আর অন্তর্বস্তু কীভাবে সামনে আনে, তা বোঝার একটা চেষ্টা আমরা করব— একথা মাথায় রেখে যে অতি সাম্প্রতিক এবং চলমান আন্দোলনের বিষয়ে এই চেষ্টা খণ্ডিত হতে বাধ্য। কিন্তু তার আগে, সাম্প্রতিক অতীতে গুরগাঁও-মানেসারের মতো শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষত অটোমোবাইল ও অনুরূপ সংগঠিত ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন পুঁজি-শ্রমের অন্তর্বিরোধের প্রকৃতি ও শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তবতাকে যেভাবে প্রভাবিত করছে, সেই প্রেক্ষাপটটি একটু বুঝে নিতে চাইব।

অটোমোবাইল শিল্পের এক কেন্দ্র হিসেবে গুরগাঁও বিকাশ লাভ করে ১৯৮৩ সালে মারুতির কারখানা স্থাপিত হওয়ার এবং তার সাথে মারুতিতে মোটর পার্টস সরবরাহের জন্য অসংখ্য ভেন্ডর কোম্পানির উৎপাদন জাল গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে। এরপর হিরো হোন্ডা ও পরবর্তীতে হোন্ডা কোম্পানির কারখানা স্থাপন হয়, গুরগাঁও শিল্পাঞ্চল গুরগাঁও থেকে মানেসর, ধারুহেরা, বাওয়াল অবধি বিস্তার লাভ করে। অটোমোবাইল-এর পাশাপাশি গারমেন্ট, আইটি, ফার্মাসিউটিকাল সহ অন্যান্য রপ্তানি-নির্ভর আধুনিক শিল্পেরও এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এই পুরো এলাকা আজ 'ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিওন' (এনসিআর)-এর অংশ, আন্তর্জাতিক পুঁজির (অটোমোবাইল ক্ষেত্র, বিশেষত জাপানি এফডিআই এবং ভারতীয় কোম্পানিগুলির অসংখ্য জয়েন্ট ভেঞ্চার) গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থল এবং দেশের নানা প্রান্তের মানুষের কর্মকেন্দ্র।

শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২০০০ সালে মারুতি গুরগাঁও প্ল্যান্টে টানা তিন মাসের ধর্মঘট এই শিল্পক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মারুতি গুরগাঁও প্ল্যান্টে উৎপাদন শুরু হওয়ার পর মারুতি ম্যানেজমেন্ট নিজেই বাইরে থেকে লোক

এনে কারখানার মধ্যে শ্রমিক ইউনিয়ন বানিয়ে দেয়, যা ভার্গব তার বইতে গর্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ইউনিয়ন হাতের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ধর্মঘট করলে কোম্পানি ধর্মঘট ভাঙার জন্য ব্যাপক ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করে উৎপাদন চালানো শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ২৪ জন ইউনিয়ন নেতাকে বাইরে রেখে শ্রমিকরা কাজে ঢুকতে বাধ্য হয়। তারপর কয়েকশ শ্রমিককে ভিআরএস নিতে বাধ্য করা হয়। উৎপাদনের মূল কাজে বেশি বেশি ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করা হয় যা তারপর এই পুরো শিল্পাঞ্চলে এক সাধারণ প্রবণতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কোম্পানি কারখানায় একটা পকেট ইউনিয়ন বানিয়ে দেয় যেখানে পরবর্তী দশ বছর কোনো নির্বাচন হয় না।

এই আন্দোলনের পর পরবর্তী ৫ বছর গুরগাঁও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে এক নিরাশাজনক অবস্থা ছিল। সে স্থবিরতা আর নিরাশা কাটে ২০০৫ সালে নিজেদের ইউনিয়ন বানানোর দাবিতে মানেসর-এ হোন্ডা শ্রমিকদের ব্যাপক আন্দোলন, পুলিশি লাঠিচার্জ ও শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের জয়ের মধ্যে দিয়ে। শ্রমিকরা নানা কারখানায় ইউনিয়ন বানানোর উদ্যোগ নিতে থাকে ও পুরো শিল্পাঞ্চলে অটোমোবাইল ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের এক স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা দেয়। ২০০৯ সালে ইউনিয়ন গঠনের দাবিতে রিকো শ্রমিকদের ৪৪ দিনের ধর্মঘট, কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের গুন্ডাদের গুলিতে এক শ্রমিকের মৃত্যু, প্রতিবাদে পুরো এলাকায় এক লক্ষ শ্রমিকের একদিনের ধর্মঘট এবং তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের পদত্যাগ, পুলিশের পক্ষ থেকে শ্রমিক হত্যার অভিযোগ বাকি শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে শ্রমিকদের জেলে পাঠানো ও আন্দোলনের পরাজয় হলেও তা এলাকার শ্রমিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর পরে মানেসর-এ ডেনসো কোম্পানিতেও ইউনিয়ন গঠনের দাবিতে ২০১০ সালে ধর্মঘট, এর মাঝে হোন্ডা, হিরো হোন্ডাতে ঠিকা শ্রমিকদের আন্দোলন, হরসরিয়া ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানিতে ইউনিয়ন গঠনের জন্য শ্রমিক ধর্মঘট ইত্যাদি ব্যর্থ হলেও তার একটা প্রভাব রয়ে যায়। ২০১১ সালের ৪ জুন থেকে মারুতির শ্রমিকদের ফ্যাক্টরি কব্জা করে ভিতরে বসে যাওয়া ও পরবর্তী আন্দোলন এই পরিস্থিতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

বাংলার তুলনায় গুরগাঁও-মানেসর-এর মত শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততার পরিবর্তনগত ও গুণগত ফারাক রয়েছে। মারুতি আন্দোলন সহ উপরে আলোচিত সমস্ত আন্দোলনই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল, কারখানাভিত্তিক ভাবে শ্রমিকরা নিজেরাই প্রায় সব ক্ষেত্রে শোষণ-দমনের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে ইউনিয়ন বানানোর প্রক্রিয়া শুরু করে, সংঘর্ষ চালায় ও প্ল্যান্টের কর্মরত শ্রমিকরাই ইউনিয়নের নেতা হিসেবে এইসব আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে। অনেকক্ষেত্রে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের কারণেই শুধু প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির সহায়তা দরকার হয়, ইউনিয়ন গঠন হয়ে গেলে তার দৈনন্দিন কাজ বা বিরোধে তাদের কোনো ভূমিকা থাকে না। ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুসারে কাগজপত্র ঠিক থাকলে ৪৫ দিনের মধ্যে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পাওয়া উচিত হলেও এই পুরো এলাকায় এটা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, বিশেষত যদি কোম্পানি না চায়। আর কোম্পানি প্রথমত চায় কারখানায় শ্রমিকদের কোনো ইউনিয়ন না থাক (এলাকায় কয়েক হাজার কোম্পানির মধ্যে বড়জোর ৬০-৭০টি তে ইউনিয়ন আছে, আর কোনো কারখানায়ই শ্রমিকদের সংখ্যাগুরু অংশ ঠিকা শ্রমিকদের ইউনিয়ন নেই, এবং আইনত তারা স্থায়ী শ্রমিকদের ইউনিয়ন এর অংশ নয়)। যদি তা সম্ভব না হয় তবে ম্যানেজমেন্ট এর পকেট ইউনিয়ন থাকুক (যেমন রয়েছে বর্তমানে মারুতি গুরগাঁও বা রিকো কারখানায়)। শ্রমিকরা যদি ইউনিয়ন বানানোর চেষ্টা করে তবে কারখানার শ্রমিক নেতৃত্বকে টাকা দিয়ে জোর করে পদত্যাগ করানো বা নেতাদের বহিষ্কারের চেষ্টা করা হয় (রিকো, ডেনসো, ২০১১ সালে মারুতি মানেসর)। কিন্তু শেষত শ্রমিকরা লড়ে ইউনিয়নের অধিকার আদায় করলে ম্যানেজমেন্ট-এর পক্ষ থেকে চেষ্টা থাকে স্থায়ী শ্রমিকদের ইউনিয়নকে কিছু সুবিধা দিয়ে ধীরে ধীরে সংখ্যাগুরু শ্রমিক, বিশেষত ঠিকা শ্রমিকদের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করার (যেমন হিরো হোন্ডা বা হোন্ডার ক্ষেত্রে বর্তমানে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে)। ইউনিয়ন বানানোর পরেও বিক্ষোভ, ধর্মঘট, সাময়িক লকআউট বা শ্রমিক নেতাদের বহিষ্কার ব্যতিরেকে ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে শান্তিপূর্ণভাবে ঠিকঠাক সেটেলমেন্ট করা কঠিন হয়। শ্রম বিভাগের হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতা, শ্রম আইন অধিকার বা ট্রেড ইউনিয়ন সুবিধার পরিধি শ্রমিকদের জন্য অনেক সীমিত হওয়ায় ও প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকদের বা ফ্যাক্টরি ইউনিয়নের ওপর অনেক কম হওয়ায় প্রায়ই ন্যূনতম অধিকারের জন্য বিরোধ স্বতঃস্ফূর্ত ও জঙ্গি রূপ ধারণ করে।

গুরগাঁও-মানেসর-এর মতো নতুন শিল্পাঞ্চলগুলিতে মারুতি সহ এই আন্দোলনগুলির স্বতঃস্ফূর্ততার চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কখনো কোনো শিল্পে সংকটের কারণে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা জন্ম নেয়— যেমন একসময় বাংলায় বা মুম্বাইতে জুট বা টেক্সটাইল শিল্পে, কিংবা সম্প্রতি গ্রীস বা ইউরোপের অন্যত্র ব্যয়সংকোচের কারণে যেমন আন্দোলন হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু মারুতি সহ অটোমোবাইল ও অনুরূপ শিল্পক্ষেত্রে, যেখানে ক্রমাগত পুঁজির নিয়োগ ঘটছে, প্রযুক্তি আর শ্রম-প্রক্রিয়ার বদল ঘটছে আর হাজার কোটি টাকার মুনাফা তৈরি হচ্ছে, সেখানে শ্রমিকদের মধ্যে যে সংঘর্ষের স্বতঃস্ফূর্ততা জন্ম নিচ্ছে, তা শিল্পক্ষেত্রে কোনো সংকটের কারণে নয়, বরং আধুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক শোষণের কারণে। তার শিকড়

রয়েছে একদিকে কারখানার শ্রম-প্রক্রিয়ায় অত্যধিক কাজের বোঝা, কাজ নেওয়ার জন্য সুপারভাইজার আর ম্যানেজমেন্টের শাসন-দমন তন্ত্র, ব্যাপক ঠিকাপ্রথা সহ কাজের আর্থিক-সামাজিক সুরক্ষা আর অধিকারের অভাবের কারণে তৈরি হওয়া ক্রোধ; আর অন্যদিকে আধুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সমষ্টিগত কাজ করা যুবা শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে একদিকে কোম্পানির ব্যবসা আর মুনাফার পরিমাণ সম্পর্কে, অন্যদিকে নিজেদের দাবি, অধিকার আর কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি করতে পারার ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তৈরি হওয়া ধারণা, সমষ্টিগতভাবে আর সংগঠিকভাবে কাজ করার ঐক্য ও অভিজ্ঞতা, নতুন জমিতে পুরানো নেতৃত্বের, ইতিহাসের ব্যর্থতার 'বোঝা' থেকে মুক্ত হয়ে লড়াই-এর প্রাথমিক সুবিধা।

গত তিন-চার দশকে সস্তা শ্রম আর বাজারের লোভে বিশ্বায়নের হাত ধরে চীন-ভারত-ব্রাজিলের মত বৃহৎ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উৎপাদনের নতুন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে, বিদেশি পুঁজি দেশীয় পুঁজির সাথে হাত মিলিয়েই নতুন বিনিয়োগ করছে। সস্তা ও অসংগঠিত শ্রমিকের জন্য আমাদের দেশেরও এমন জায়গায় পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে, যেখানে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস নেই। কাজের সুযোগ যা তৈরি হচ্ছে, তা বেশিরভাগই অস্থায়ী, অসুরক্ষিত আর ন্যূনতম বেতনের কাজ। নতুন প্রযুক্তি আর ম্যানেজমেন্ট কৌশলের সাথে শ্রম-প্রক্রিয়াও দ্রুত বদলেছে। এখন এক ছাদের তলায় হাজার হাজার শ্রমিকের মাধ্যমে একসাথে প্রয়োজনীয় ছোট কলকব্জা থেকে অন্তিম পণ্য তৈরির আর রক্ষণাবেক্ষণের 'ফোর্ডীয় উৎপাদন ব্যবস্থা'র বদলে উৎপাদনের নানা ধাপকে আলাদা আলাদা কোম্পানিতে, আলাদা আলাদা এলাকায়, আলাদা আলাদা দেশে বিকেন্দ্রিত করে দেওয়া হয়েছে— গড়ে উঠেছে এলাকাগত বা আন্তর্জাতিক 'উৎপাদন শৃঙ্খল'। মারুতির গাড়ি অ্যাসেম্বলি হয় মানেসর প্ল্যান্টে, কিন্তু ১৫০০-র বেশি ভেন্ডর কোম্পানি থেকে কলকব্জা আসে। এসার থেকে শিট মেটাল, সুব্রোস থেকে এয়ার-কন্ডিশনার, বেলসনিকা থেকে ডাই, সোনা স্টিয়ারিং থেকে স্টিয়ারিং, ডেলফি থেকে সাসপেনশন, আইজেএল থেকে হেডলাইট, নেরোল্যাক থেকে পেন্টস, আর কে ডি পার্টস আসে জাপান, ইউরোপ কোরিয়া থেকে। ছোট নাটবল্টু, ফোর্জিং, ওয়েল্ডিং-এর কাজ কোনো বস্তির ভেতরে অসংগঠিত ক্ষেত্রে হয়। আসলে সবাই মারুতি শ্রমিক, কিন্তু তার মাত্র ২-৩ শতাংশ 'মারুতি শ্রমিক' হিসেবে দৃশ্যমান। তারও ৭০ শতাংশ আবার অস্থায়ী শ্রমিক। ফলে শুধু একটি ফ্যাক্টরিতে শুধু স্থায়ী শ্রমিকদের নিয়ে ষাট-সত্তরের দশকের বাস্তবতায় কাজ করে চলা পুরনো ধারার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দরাদরি করার ক্ষমতা অনেক কমে গেছে।

এই পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত সচল রাখতে 'জাস্ট-ইন-টাইম' ব্যবস্থা দরকার, উৎপাদনের খরচ কমাতে আর উৎপাদন হার বাড়াতে জাপানে উৎপন্ন ম্যানেজমেন্ট কৌশল 'লিন উৎপাদন ব্যবস্থা'য় ক্রমাগত সময়, জায়গা, কাঁচামালের 'অপচয়' কমানো দরকার, নতুন নতুন পণ্য তৈরি করতে নিত্যনতুন প্রযুক্তি আর 'ফ্লেক্সিবল' শ্রম-প্রক্রিয়া, শ্রম-বল আর শ্রম-অধিকার দরকার, যে-সবের ভয়ানক বোঝা বইতে হয় শেষত কারখানার শ্রমিকদের। এই কারণে বড় গোলমালের স্থায়ী সম্ভাবনা থেকে যায়। মারুতিতেও ৪ জুন ২০১১ সালের আগেও যে কোনো সময় ফ্যাক্টরি কব্জা করা বা বড় ধরনের মারপিট হতে পারত। মারপিটের অভিযোগে আজ হিরো হোন্ডার মতো শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি সহ চারজন, সুজুকি বাইকের শ্রমিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি ও এলাকার আরও শ্রমিক নেতা ও অসংখ্য সাধারণ শ্রমিক বরখাস্ত-বহিষ্কৃত হয়ে আছে।

এই প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে মারুতি শ্রমিকদের আন্দোলন বিষয়ক আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। ইতিপূর্বে *অনীক* পত্রিকায় মারুতি আন্দোলনের ঘটনার বর্ণনা সহ লেখা প্রকাশিত হয়েছে, আমরা ঘটনার বিস্তারে প্রবেশ করব না। বরং আন্দোলন যে সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক, নতুনত্ব ও সমস্যা-সম্ভাবনা হাজির করেছে, তার বিশেষ কিছু দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

মারুতি শ্রমিকদের লড়াইয়ের অন্তর্বস্তু

মারুতি শ্রমিকদের সংঘর্ষ সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন লড়াইয়ের মত কোনো আর্থিক দাবিসনদ নিয়ে শুরু হয়নি। স্বাধীন 'শ্রমিক ইউনিয়ন'-এর দাবি আসলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শোষণ-দমনের বিরুদ্ধে স্থায়ী-ট্রেনি-ঠিকা সমস্ত শ্রমিকের সমষ্টিগত ক্রোধ আর তার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। তার সাথে যে বিষয়গুলো শ্রমিকরা তুলেছিল, যেমন লাঞ্চ আর চা-এর বিরতির সময় বাড়ানো, অ্যাসেম্বলি লাইনের গতি কমানো, সুপারভাইজারদের মাত্রাতিরিক্ত চাপ আর অভদ্র ব্যবহার বন্ধ করা, কাজের ফাঁকে বিশ্রামের সময় আর ছুটির সুবিধা— এইসব দাবি আসলে যে নিছক কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সমঝোতা করে মেটাবার নয়, যদি না সমস্ত শ্রমিকের নিরন্তর ঐক্যের ভিত্তি অটুট থাকে, এটা শ্রমিকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে গিয়েছিল। সংঘর্ষের এই ধরনের অন্তর্বস্তু আসলে প্রতিদিনকার শ্রম-প্রক্রিয়ায় শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বের সাথে, কারখানার শপ-ফ্লোরে শ্রেণী সংগ্রামের ভ্রূণের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত শ্রম-প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে— স্থায়ী-ঠিকা, সংগঠিত-অসংগঠিত, স্থানীয়-প্রবাসী, অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্ট-ভেন্ডর কোম্পানি, অটোমোবাইল শ্রমিক - গারমেন্ট শ্রমিক ইত্যাদি ইত্যাদি। ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে শ্রমিক আন্দোলনের মর্মবস্তু শ্রমিকদের নিজেদের আপাতদৃষ্টিতে আর্থিক স্বার্থে এই বিভাজন ভেঙ্গে দিয়ে মালিকের বিরুদ্ধে একজোট হওয়া। আমাদের দেশের ট্রেড

ইউনিয়ন আইন এমনিতেই স্থায়ী-ঠিকা শ্রমিককে এক ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দেয় না। তার ওপর অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত 'সফল' ট্রেড ইউনিয়ন সমঝোতা স্থায়ী শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে গিয়ে এই বিভাজন বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু আন্দোলনের অন্তর্বস্তু যদি আসলে শ্রম-প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সমস্ত শ্রমিকের জন্য সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় হয়, তবে সে আন্দোলনে শ্রমিকদের বাস্তবিক ঐক্যের আধার তৈরি হয়, আর মালিকদেরও নিছক আর্থিক দাবির তুলনায় এই ধরনের দাবি মেটানো 'জাস্ট-ইন-টাইম' আর 'লিন' উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অনেক মুস্কিল, আর শুধু তাই নয়, ভয়েরও বটে। কারণ, আসলে তো শ্রম-প্রক্রিয়ায় সাধারণ শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ আর চলমান পুঁজি-শ্রমের দ্বন্দ্ব শ্রমিকের চেতনাস্তর বাড়িয়ে তোলে। এতসব তত্ত্ব না করেও প্রতিদিনের জীবনের অভিজ্ঞতায় মারুতি শ্রমিকরা এটা বুঝেছিল, তাই প্রথম ধর্মঘটের পর আর ইউনিয়ন বানিয়ে ফেলার পর ফ্যাক্টরিতে সম্মানের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা, সুপারভাইজারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলা সাহস, কম কাজের বোঝা, এক লাইনে আগের তুলনায় বেশি লোক একসাথে কাজ করা অথবা বেশি 'রিলিভার'-এর সুবিধা শ্রমিকদের কাছে কোনো আর্থিক জয়ের তুলনায় বেশি মূল্যবান ছিল। এই অন্তর্বস্তুর ওপর দাঁড়িয়েই ঠিকা শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবিতে ২০১১ সালের ৮ অক্টোবর স্থায়ী শ্রমিকরা তৃতীয় দফার ঐতিহাসিক ধর্মঘট করেছিল, আর মমর্বস্তুতে এক সাধারণ অনুভূতির কারণে লড়াইয়ের সমর্থনে সেদিন সুজুকি পাওয়ারট্রেন, সুজুকি বাইক, বাজাজ মোটর সহ ৮টি কোম্পানির শ্রমিকরা উপরতলার স্থাপিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের নির্দেশ উপেক্ষা করে 'বেআইনি' ধর্মঘট করেছিল, যে কারণে মারুতির শ্রমিকরা ছাড়াও সুজুকি পাওয়ারট্রেনের ইউনিয়ন-প্রধান সহ তিন শ্রমিক বহিষ্কৃত হয়। ইউনিয়ন তৈরি হওয়ার পর যখন শ্রমিকরা ঠিকাপ্রথার অবসান দাবি করে (যে দাবি তখন মানা না হলেও বর্তমানে খাতায়-কলমে কোম্পানি মেনে নিয়েছে) কিংবা শিশুদের শিক্ষার জন্য ম্যানেজমেন্টের সমান ভাতা দাবি করে, কারণ সবার সন্তানেরই সমমানের শিক্ষার সুযোগ হওয়া উচিত, তখন এই দরাদরির অন্তর্বস্তু নিছক আইনি ট্রেড ইউনিয়ন স্তরের আর্থিক দরাদরিতে সীমিত থাকেনি, যা ম্যানেজমেন্টও গভীরভাবে বুঝেছিল। ১৮ জুলাই-এর 'বিদ্রোহ'-এর বীজ অনেক আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিল, আন্দোলনের অন্তর্বস্তুতে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ততার অভিব্যক্তি সময়ের আর অভিজ্ঞতার সাথে সাথে বদলেছে। ২০১১ সালের তিন তিনটি ধর্মঘটের সময়েও যা ঘটেনি, ক্রমাগত শ্রম বিভাগ, শ্রম আইন আর স্থাপিত ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতির অন্তঃসারশূন্যতা অনুভব করতে করতে ১৮ই জুলাই বাস্তবত শ্রমিকরা শুধু ম্যানেজমেন্টের শোষণ-দমন আর ধোঁকাবাজি নয়, স্থাপিত আইনি ট্রেড ইউনিয়ন তন্ত্রটার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

আন্দোলনের রূপ-এর ব্যাপকতা ও নতুনত্ব

আন্দোলনকে শক্তিশালী রাখার জন্য আর ব্যাপক শ্রমিকের ঐক্য বজায় রাখার জন্য শ্রমিকদের প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামোর আইনব্যবস্থার আর প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির সাহায্যের সীমাবদ্ধতা চেনার সাথে সাথে আন্দোলনের স্তর মাথায় রেখে আন্দোলনের নতুন নতুন রূপ নিতে হয়েছে। শ্রমিক ধর্মঘটের প্রচলিত পদ্ধতি, অর্থাৎ কাজ বন্ধ করে গেটের বাইরে অবস্থান গুরগাঁও-মানেসর এলাকায় মারুতি গুরগাঁও, রিকো, সামবিম, ডেনসো ইত্যাদি কোম্পানিতে ইতিপূর্বে সংকটে পড়েছে। ম্যানেজনেন্ট ধীরে ধীরে ঠিকা শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন চালানোর চেষ্টা করেছে। এই অভিজ্ঞতা মারুতি শ্রমিকদের কারখানা দখল করে ভেতরেই অবস্থান করার আপাত 'বেআইনি' অথচ আন্দোলনের নিরিখে সফল পদ্ধতি নিতে প্ররোচিত করেছে, যা পরে পাওয়ারট্রেন, সুজুকি বাইক থেকে শুরু করে সম্প্রতি বাওয়াল শিল্পক্ষেত্রে ঘোসী ইন্ডিয়ার শ্রমিকরা অনুকরণ করেছে। মারুতি শ্রমিকরা নিজেদের ঐক্যের ওপর ভরসা করে প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতির বাইরে ও শ্রম আইনের চোখে 'বেআইনি' বহু কাজ করেছে, যা বাস্তবত আন্দোলনের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। যেমন দ্বিতীয় ধর্মঘটের শেষে 'গুড কন্ডাক্ট বন্ড' সই করার মাত্র ৮ দিন বাদে তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ঠিকা শ্রমিকদের জন্য হরতাল করে প্ল্যান্ট কব্জা করা ও সুজুকির বাকি দুই প্ল্যান্টেও আন্দোলনের সমর্থনে ধর্মঘট ও কব্জা সংগঠিত করা, কারখানা চলাকালীন ম্যানেজমেন্টের ওপর চাপ তৈরি করতে উৎপাদন স্লো করে দেওয়া ইত্যাদি। ১৮ই জুলাইয়ের পর মানেসর এলাকায় দমনের মুখে যখন খানিক পিছু হটতে হয়েছে, তখন এলাকার বাকি শ্রমিকদের ও সমাজের সমর্থন জোটাতে সম্পূর্ণ আইনি পদ্ধতি ব্যবহার করে প্ল্যান্টের মধ্যে, বাইরে শিল্পক্ষেত্রে, হরিয়ানার ও সারা দেশে আন্দোলনের সবচেয়ে ব্যাপক রূপ দিতে হয়েছে। ধাপে ধাপে প্রথমে সুজুকির তিন কোম্পানির ভিতরে, তারপর অটো শ্রমিক সম্মেলন করে এলাকার ব্যাপক অটোমোবাইল শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গড়ার চেষ্টা করে, জেলে বন্দি শ্রমিক, প্ল্যান্টে কর্মরত শ্রমিকদের সাথে নেওয়ার জন্য দুদিনব্যাপী একসাথে অনশন করে, হরিয়ানাব্যাপী সাইকেল যাত্রা করে পরিবারের লোকেদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামীণ জনতার মধ্যে প্রচার করে, দেশব্যাপী নানা শ্রমিক সংগঠনের সাথে প্রদর্শন-প্রতিবাদ দিবস পালন করে, অনির্দিষ্টকালীন অনশন করে, আবার প্রয়োজনে ব্যারিকেড আর ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে জেলে গিয়ে শ্রমিকরা আন্দোলনকে ব্যাপক, প্রাসঙ্গিক ও জীবন্ত রেখেছে। তরুণ শ্রমিকদের সোশাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য ইউনিয়নের

ব্লগ, ফেসবুক, ইউ-টিউব-এর সাহায্য নেওয়া কিংবা সাংবাদিকদের সাথে টেলি-কনফারেন্স আন্দোলনকে দেশে, এমনকি দেশের বাইরেও, অভিনব প্রচার দিয়েছে।

সংগঠন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও নেতৃত্ব

প্রচলিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতিতে সাধারণ শ্রমিকদের এক অগণতান্ত্রিক পরিবেশে উপরের কিছু নেতার নির্দেশে চলতে হয়, যেখানে স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া বা প্রয়োগ করার সুযোগ বিশেষ থাকে না। এই প্রক্রিয়া ব্যাপক সাধারণ শ্রমিকদের স্বতন্ত্র শ্রেণীচেতনার বিকাশ ঘটানোর, স্বাধীন সৃজনশীলভাবে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার, বা নতুন পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা করার প্রায় কোনো সুযোগ দেয় না। আমরা যারা ব্যবস্থা বদলের স্বপ্ন দেখি বা নতুন সমাজ চালনায় ব্যাপক মেহনতি মানুষের গণতান্ত্রিক সৃজনশীল অংশগ্রহণের কথা ভাবি, বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির গণ্ডিতে ব্যাপক শ্রমিকের জন্য গণতন্ত্রের সুস্পষ্ট অভাব সেই ভবিষ্যতের প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও এক গভীর প্রতিবন্ধকতা হাজির করে। মারুতি আন্দোলনে সংঘর্ষের প্রয়োজনে যেভাবে শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠিত করেছে, সমষ্টিগতভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সৃজনশীল পদক্ষেপ নিয়ে আন্দোলনের ব্যাপক রূপ নিয়েছে— তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্ল্যান্টে ইউনিয়ন বডির সাথে প্রতি লাইনের হিসেবে প্রতিনিধি নিয়ে প্রায় দেড়শ লাইন কো-অর্ডিনেটরকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে অংশগ্রহণ করানো, সিদ্ধান্ত রূপায়ণ ও 'ফিডব্যাক' নেওয়া, ১৮ই জুলাইয়ের পর শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রভিসনাল কমিটির সাথে জেলা ও রাজ্য কো-অর্ডিনেটর বডির মাধ্যমে আন্দোলন চালানো, শ্রমিকদের জেনারেল বডি মিটিং করে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া— এগুলি প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতিকে অনেক বদলে দিয়েছে। আন্দোলনের সাথে শ্রমিকদের এত গভীর সংযোগের ফলে, নিচে থেকে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ আর চাপের কারণে কখনই নেতৃত্ব, ইউনিয়ন বা আন্দোলন ম্যানেজমেন্টের প্রভাবে আসতে পারেনি।। প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি, যেমন HMS, AITUC, CITU ইত্যাদি, একে নিজেদের কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। বরং, তৃতীয় ধর্মঘটের পর ৩০ জন নেতৃত্বকারী শ্রমিক কারখানা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও, ১৯ই জুলাইয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত পুরো ইউনিয়ন বডি সহ ১৪৯ জন জেলে যাওয়ার পরেও, ৬৬ জন পলাতক থাকার পরেও বার বার নতুন নেতৃত্ব উঠে এসেছে, আন্দোলনকে পুনরায় এগিয়ে নিয়ে গেছে— যা এক আশ্চর্যজনক সাফল্য।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মারুতি আন্দোলন

কারখানার ভেতরে প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতির নখদন্তহীনতা শ্রমিকরা গভীরভাবে অনুভব করেছিল। প্রথম ইউনিয়নের সোনু গুজ্জর, শিবকুমারদের ২০০১ সালে জোর করে পদত্যাগ করানোর ঘটনা মারুতির প্রতিটি শ্রমিকের মনে মারুতি ম্যানেজমেন্ট আর শ্রমবিভাগের প্রতি যে বিদ্বেষ আর ঘৃণার জন্ম দিয়েছিল, অবশেষে ২০১২ সালে ইউনিয়ন পঞ্জিকরণের পরও প্রতিদিনকার ঘটনা তাকে আরো তীব্র করেছিল। যেমন, স্বাধীনভাবে ইউনিয়ন চালানোর প্রশ্নে, ট্রেনি আর ঠিকা শ্রমিক দিয়ে বেআইনিভাবে উৎপাদন চালানোর প্রশ্নে, কাজের মাঝে বিরতি কিংবা উপযুক্ত বিশ্রামের প্রশ্নে, শ্রমিকদের বাসস্থান বা শিশুদের শিক্ষার প্রশ্নে— সেটেলমেন্ট প্রক্রিয়াকে বার বার খারিজ করে ম্যানেজমেন্ট সাধারণ শ্রমিকের সামনে ইউনিয়নকে প্রভাবহীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে, আর ইউনিয়ন গঠনের সামগ্রিক বিষয়টিকেই নিরর্থক দেখানোর চেষ্টা করেছে। এক কথায় এটাই বলা যেতে পারে, মারুতি ম্যানেজমেন্ট বার বার এটাই প্রমাণিত করার চেষ্টা করছিল যে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ আর তার পরিধি আসলে মালিকের দ্বারাই নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, শ্রমিক নেতৃত্বকে সেটা বুঝে নিতে হয়। ১৮ জুলাইয়ের ঘটনা এভাবে গড়ে তোলা ট্রেড ইউনিয়ন তন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত আক্রোশে এক বিদ্রোহ ছিল, যার মাধ্যমে এই কপটতাকে জোরদার ধাক্কা দিয়ে শ্রমিকরা তার সাথে নিজেদের জীবন-জীবিকাকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংকীর্ণ পরিধি থেকে বের করে পুঁজিপতিদের শোষণ-দমনের তন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

মারুতি আন্দোলন গুরগাঁও এলাকায় এবং দেশব্যাপী একদিকে HMS, AITUC-এর মত দালাল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন আর অন্যদিকে এই সব ইউনিয়নের মত মুখে লড়াইয়ের কথা বলে আপসকামী রাজনীতি করা— এই দুই ধারার রাজনীতির বিরুদ্ধে, তথা উৎপাদনের নতুন জমিতে পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে জন্ম নেওয়া অটোমোবাইল শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সংঘর্ষ ও শ্রমিকদের নিজস্ব স্বাধীন ইউনিয়ন বানানোর এক নতুন ধারার প্রতিনিধি। এই আন্দোলনের অন্তর্বস্তু, সংগঠন, রূপ, সংঘর্ষমুখীনতা প্রতিষ্ঠিত দুটি ধারার ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির জানা-বোঝা, পদ্ধতি আর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। গুরগাঁও থেকে বাওয়াল পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে কিছু স্বাধীন ফ্যাক্টরি ইউনিয়ন আর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কে থাকলেও বাস্তবত স্বাধীনভাবে কাজ করে চলা কিছু ফ্যাক্টরি ইউনিয়ন ছাড়া মারুতি শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে বিশেষ কোনো সাহায্য মেলেনি। কেননা, এই আন্দোলনে এইসব সংগঠনের নেতৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি তথা এলাকার অন্য প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন ১৮ই জুলাইয়ের ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যপূর্ণ' রায় দিয়ে মারুতি আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। কেউ দোষী

শ্রমিকদের শাস্তি দেওয়ার কথা বলেছে, কেউ ঘটনাকে 'নিন্দনীয়' আখ্যা দিয়ে এর পিছনে 'বাইরের শক্তির হাত' থাকার কথা সাফ জানিয়েছে। এই সংগঠনগুলির আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের মারুতি আন্দোলনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ধারাকেও ক্রমাগত বাধা দিয়ে গেছে। আজ গুরগাঁও সহ সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিপক্ষে সংঘর্ষকারী স্বাধীন গণতান্ত্রিক ধারার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন— মারুতি আন্দোলন যে রাস্তা দেখিয়েছে।

এলাকাগত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মারুতি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছে। আন্দোলনের ফলে মারুতির মত শক্তিশালী কোম্পানি মানেসর প্ল্যান্টে মূল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। গুড়গাঁও-মানেসর এলাকায় অটোমোবাইল ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বেতন কাঠামোর পরিবর্তনেও এই আন্দোলনের ছাপ রয়ে গেছে। ১৮ই জুলাই এর পর মারুতির গুড়গাঁও আর মানেসর প্ল্যান্টে ১৩০০০ টাকা এবং হোন্ডা কোম্পানিতে ১৭০০০ টাকার বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। শুধু তাই নয়, এটা বলা যেতে পারে যে দেশের অটোমোবাইল শিল্পে বেতন-কাঠামোয় এই লড়াই একটা সদর্থক প্রভাব ফেলতে পেরেছে। তামিলনাড়ুতে প্রিকল, নয়ডাতে গ্রাজিয়ানো অটো-পার্টস কোম্পানিতে ক্রুদ্ধ শ্রমিকদের আক্রমণে ম্যানেজমেন্ট-এর মৃত্যুর ঘটনার পর মারুতির ১৮ই জুলাইয়ের ঘটনা মালিকদের মনে একটা ভয় তৈরি করেছে, "আবার 'মারুতি' না হয়ে যায়।" এটা সত্যি যে ১৮ জুলাইয়ের পর আজ পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর পুরো মানেসর এলাকায় শ্রমিকদের কোনো ধরনা-বিক্ষোভ প্রদর্শন-মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আজও মারুতি মানেসর প্ল্যান্টে পুলিশি উপস্থিতিতে উৎপাদন চলছে। বলা যায়, শ্রমিক অসন্তোষকে দমিয়ে রাখতে পুরো 'জাস্ট-ইন-টাইম' উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকারের প্রশ্নে এক 'স্থায়ী ব্যতিক্রমী অবস্থা' পুলিশ-প্রশাসনের মদতে জারি রাখতে হয়েছে, যা কোনো লিবারেল ডেমোক্রেসির ভাবনার সাথে খাপ খায় না। কিন্তু এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, আজ শোষণ-দমনের মুখে শ্রমিকদের অসন্তোষ আর ক্রোধের ভীতি মালিকদের ভাবনার গভীরে প্রবেশ করেছে। আর এই দমনকারী পদক্ষেপ মালিকশ্রেণীর সেই ভয়েরই প্রতিফলন। ফলে শ্রমিকরা যদি সাহস আর বিচক্ষণতার সাথে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সমষ্টিগত লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তবে এই পরিস্থিতির সদর্থক ফায়দা উঠিয়ে চলমান পুঁজি-শ্রমের লড়াইয়ে সুসংগঠিতভাবে মালিকদের ওপর চাপ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

মারুতি আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো— আজকের ভারতে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে যেখানে পুঁজির ক্রমাগত বিনিয়োগ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে, সেখানেও শোষণের নতুন জমিতে বিপ্লবী রাজনীতির জায়গা তৈরি হতে পারে। শুধু ছোট ছোট, বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা বন্ধ হওয়ার মুখোমুখি কারখানার শ্রমিকদের মাঝে, কিংবা সমাজের অন্যত্র হতদরিদ্র 'প্রান্তিক' মানুষের মধ্যেই সংগঠিত বিপ্লবী রাজনীতির সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ আছে, পুঁজির মূল উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগের জায়গায় শ্রমিকদের মধ্যে আজ বিপ্লবীদের তেমন কোনো জায়গা নেই— এই হতাশার বাষ্পকে মারুতি আন্দোলনকারী শ্রমিকদের সাথে নানাবিধ বিপ্লবী শক্তির উপস্থিতি ও প্রভাবের জীবন্ত বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে। বিপ্লবী শক্তি ও সংগঠনগুলি মারুতি আন্দোলনকে অনেক কিছু দিয়েছে, মারুতির আন্দোলনরত শ্রমিকরাও বিপ্লবীদের অনেক কিছু দেখিয়েছে ও দিয়েছে। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে লড়াকু শ্রমিকরা আন্দোলনের নতুন নতুন রূপ নেওয়া সত্ত্বেও ম্যানেজমেন্ট-প্রশাসনের প্রচণ্ড দমনের মুখে যখন প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির বাস্তবত কোনো সমর্থন পাওয়া যাচ্ছিল না, আন্দোলনের সামনে সংকট তৈরি হয়েছিল তখন, বিশেষত তৃতীয় ধর্মঘটের পর শ্রমিক নেতৃত্বের পদত্যাগের পর, আর ১৮ই জুলাইয়ের ঘটনার পরে রাষ্ট্রের দমনের সামনে, এবং তার পরবর্তী দীর্ঘ সময় জুড়ে বিভিন্ন সংকটজনক মুহূর্তে বিপ্লবী শক্তিগুলির নিরন্তর আর নিঃশর্ত সমর্থন, আর তাদের মাধ্যমে দেশব্যাপী নানা প্রগতিশীল সংগঠন, শ্রমিক সংগঠনের সাহায্য শ্রমিকদের দালাল আর আপসকামী ট্রেড ইউনিয়নের নির্ভরতা কমিয়ে আন্দোলনকে স্বতন্ত্রভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বিপ্লবী শক্তিগুলি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের হার-জিতের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আন্দোলনের আসল তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করেছে ও তাদের মনোবল বাড়িয়েছে। মারুতি আন্দোলনের বিভিন্ন দফায় শ্রমিকরা শুধুমাত্র নিজেদের সমষ্টিগত উদ্যোগে বহু অনুপ্রেরণাদায়ক পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তবুও সারা দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলির এই সাহায্য ছাড়া নিরাশার কারণে আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রভাবে বা কিছু হিংসাত্মক ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যেতে পারত। এছাড়া, গুড়গাঁও-মানেসর ক্ষেত্র মারুতি আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকরা এই প্রথম একদিকে যেমন বিপ্লবীদের নানা ধারার সংস্পর্শে এসেছে, তেমনই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও ধারার সাথে সম্পর্ক রেখেছে, আর নিজেদের অভিজ্ঞতায় বিপ্লবী ধারার সাথে বাকিদের একটা ফারাক করতে পেরেছে। অপরদিকে বিপ্লবী কর্মীরাও মারুতির মতো আন্দোলন থেকে প্রচুর আশা ও উদ্যম সংগ্রহ করেছে। মারুতির মত এত শক্তিশালী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, পুরো হরিয়ানা পুলিস-প্রশাসনের দমনের মুখে, জেল-লাঠিচার্জ-বেকারি সহ্য করে এত দীর্ঘ একটা হার-না-মানা

প্রায় অসম্ভব লড়াই যে শ্রমিকরা লড়তে পারে— এটা আজকের তুলনামূলক নিথরতার সময় বিপ্লবীদের, বিশেষত যারা পুঁজিবাদী শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণের পক্ষে লড়াই করে, তাদের জন্য একটা রসদ। সারা দেশের নানা বিপ্লবী শক্তি, প্রগতিশীল শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সম্পর্কের একটা আধার হিসেবেও এই আন্দোলন কাজ করেছে।

আজ গোটা দুনিয়ার সাথে আমাদের দেশেও শ্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন সংকটের পর্ব দিয়ে চলেছে। গত ৩০-৪০ বছরে গ্রাম এবং শহর উভয় জায়গাতেই দ্রুত পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একদিকে এক সময়কার গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার বিপ্লবী রণনীতি জমি হারাচ্ছে, 'লাঙ্গল যার জমি তার' স্লোগানে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের অংশ হিসেবে বিপ্লবী ভূমিসংস্কারের জন্য 'জমিদার-জোতদার' বিরোধী লড়াইয়ের জমি ও প্রেক্ষাপট আজ অনেকটাই বদলে গেছে, পাহাড়-জঙ্গলের আরো 'প্রান্তিক' এলাকায় আরো 'প্রান্তিক' মানুষের মধ্যে সে লড়াই সীমায়িত হয়েছে। অপরদিকে, এক একটা ফ্যাক্টরিতে এক ছাদের নীচে প্রচুর সংখ্যায় মূলত স্থায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ করে চালানো উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে, আর্থিক-সামাজিক-জীবিকার দিক থেকে অসুরক্ষিত এক বিশাল শ্রমিকবাহিনীর উপস্থিতির ফলে, দেশি-বিদেশি পুঁজির মুনাফার তাগিদে শ্রম-প্রক্রিয়ায় দ্রুত বদলের সাথে সাথে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মালিকের সাথে দর কষাকষির ক্ষমতা কমে গেছে। এর সাথে সংশোধনবাদী বামেদের হাত ধরে চলা এক সময়কার প্রভাবশালী ট্রেড ইউনিয়ন স্তরের শ্রমিক আন্দোলন পুঁজির আক্রমণের সামনে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। অথচ এই পর্বে মারুতির মত আপাতভাবে ট্রেড ইউনিয়ন স্তরের আন্দোলনগুলিতেও উৎপাদনের নতুন পরিস্থিতিতে পুঁজি-শ্রমের মধ্যে শ্রম-প্রক্রিয়া ও কাজের আর্থিক-সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নে যে তীব্র বিরোধ তৈরী হচ্ছে, তা বাস্তবত পুরনো ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন দরাদরির, যা মূলত শ্রমিকদের শ্রম-প্রক্রিয়ায় জাত পুঁজির শোষণ-দমনের যন্ত্রণা-অভিজ্ঞতা-ক্রোধ থেকে বিচ্ছিন্ন, সেই কাঠামোয় অসমাধানযোগ্য হয়ে পড়ছে। আর বিশাল সংখ্যার অসংগঠিত শ্রমিক এই দরাদরির বাইরে থেকে যাচ্ছে। ফলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে দর-কষাকষি করতে পারা ভালো নেতার তুলনায় সাহসী আর আপসহীন লড়াইয়ের বেশি বেশি দরকার পড়েছে। উৎপাদন-শৃঙ্খলে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ফ্যাক্টরিগুলিতে অনবরত উৎপাদন ভাগ নেওয়া শ্রমিকদের, বা একটি সমগ্র শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের, সংঘর্ষের জমিতে বাস্তব ঐক্য তৈরি করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে, কারণ পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নতুন জমি তৈরি হচ্ছে। মারুতির ধর্মঘটের সময় মারুতিতে মোটর-পার্টস সরবরাহ করার বহু ভেন্ডর কারখানায় উৎপাদন বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই আর শ্রমিক বিক্ষোভ হয়। পাওয়ারট্রেন শ্রমিকরা মারুতি আন্দোলনে ইঞ্জিন তৈরি বন্ধ করে দেওয়ায় মারুতির গুড়গাঁও প্ল্যান্টের উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ঘোসী কোম্পানীতে ধর্মঘট চলার সময় মালিক বাইরে থেকে অস্থায়ী শ্রমিক এনে উৎপাদন চালানোর চেষ্টা করলে হোন্ডার ইন্সপেকসন বিভাগের শ্রমিকা ঘোসী থেকে আসা মোটর-পার্টস কম গুণবেত্তার কারণে ক্রমাগত বাতিল করলে হোন্ডার চাপ সরাসরি ঘোসীর মালিকের ওপর পড়ে। রিকো কারখানায় ২০০৯ সালে ৪৪ দিন ধর্মঘটের ফলে আমেরিকা আর কানাডায় জেনারেল মোটর্স প্ল্যান্টে তিন দিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছিল মোটর-পার্টসের তাৎক্ষণিক সরবরাহের অভাবে। কিন্তু শ্রমিকদের আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা, সংঘর্ষের নতুন অন্তর্বস্তু-রূপ-সংগঠনের সম্ভাবনাকে ধারণ করে একটি সামগ্রিক প্রয়োগ করার জন্য শ্রমিকদের জীবনের, শ্রম প্রক্রিয়ার ও আন্দোলনের সাথে যতটা একাত্মতা দরকার, মনোগতবাদের সমস্যা যতটা কাটানো দরকার, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন, কোনো ফ্যাক্টরির আন্দোলনের সাথে বাকি শিল্পক্ষেত্রের আন্দোলন, সংগঠিত-অসংগঠিত স্থানীয়-প্রবাসী বা অটোমোবাইল-গার্মেন্টি অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরের বাস্তবিক শ্রমিকের ঐক্যের জন্য যে বিভিন্ন রূপ ও চরিত্রের সংগঠন তৈরি করা দরকার, আইনি-বেআইনি আন্দোলনের যে সমন্বয় দরকার, শ্রমিকদের শ্রম-প্রক্রিয়া, ভাষা, সংস্কৃতি আর জীবন-নিরপেক্ষ ভাবে ভারি ভারি রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার একমাত্রিক 'সচেতনতা' শ্রমিক আন্দোলনে নিয়ে যাওয়ার সমস্যা যতটা বোঝা দরকার, শ্রমিকদের কারখানার শ্রম প্রক্রিয়ায় সংগঠিত ভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আর গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক আদান-প্রদানের জায়গা তৈরি করে যে ধরনের আন্দোলন-সংগঠন তৈরি করতে সাহায্য করা দরকার, তার ঐতিহাসিক খামতি বিপ্লবী সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে এই কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। কৃষি-বিপ্লব আর পুরনো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জমির ক্ষয়ের সাথে সাথেই ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় নতুন শিল্পাঞ্চলগুলিতে বর্তমান বিকাশ মডেলের ভেতর শ্রম-পুঁজির মধ্যে যে মীমাংসার অযোগ্য বিরোধের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে— তার প্রকৃত বোঝাপড়া, তত্ত্বায়ন আর সৃজনশীল সাহসী প্রয়োগ ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব হাজির করে। যারা বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন, আন্দোলন থেকে শুধু 'অনুপ্রেরণা' নেওয়ার বদলে, 'শিক্ষিত' করার বদলে, 'সহযোগিতা' করার বদলে তাদের জন্য বৃহত্তর দায়িত্ব অপেক্ষা করছে।

কেন্দ্রীয় সরকার গত ২০০৭ সালেই দিল্লি থেকে মুম্বাই পর্যন্ত ১৪৮৩ কিমি লম্বা 'দিল্লি মুম্বাই শিল্প করিডর' তৈরি

করার কথা ঘোষণা করেছে। এটি হবে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শিল্প-পরিকল্পনা। যার প্রথম দফার কাজ, এই করিডর বরাবর প্রতিটি অন্তত ২০০ বর্গ কিমি এলাকা নিয়ে মোট ১১টি ‘বিনিয়োগ ক্ষেত্র’ এবং এক একটি অন্তত ১০০ বর্গ কিমি এলাকার ওপর থাকা মোট ১৩টি ‘শিল্প ক্ষেত্র’ বানানোর কাজ ২০১৭ সাল অবধি চলবে। এবং পুরো পরিকল্পনা দিল্লির ১০০ শতাংশ, হরিয়ানার ৬০ শতাংশ, রাজস্থানের ৫৮ শতাংশ, গুজরাটের ৬২ শতাংশ, মহারাষ্ট্রের ১৮ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশের ১২ শতাংশ এবং উত্তরাখণ্ড ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে ২০৪০ সাল অবধি চলবে। বলাবাহুল্য, ৩৫৪ বর্গ কিমি এলাকায় পরিকল্পিত গুড়গাঁও-মানেসর-ধারুহেরা-বাওয়াল শিল্পাঞ্চল এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। দক্ষিণ ভারতেও এরূপ দুটি শিল্প করিডোর তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে এবং ২০১০ সালের ভারত সরকার ‘জাতীয় ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পনীতি’ ঘোষণা করে, যাতে ‘জাতীয় ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প বিনিয়োগ এলাকা’-র বিকাশ ঘটানোর পরিকল্পনা হয়েছে। প্রথম দফায় ‘দিল্লি মুম্বাই শিল্প করিডর’ বরাবর ৬টি ‘বিনিয়োগ ক্ষেত্র’তে এই পরিকল্পনা লাগু করার কথা, যার মধ্যে গুড়গাঁও-মানেসর শিল্পাঞ্চল একটি। ‘জাতীয় ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প বিনিয়োগ এলাকা’-র মধ্যে এসইজেড সহ একাধিক ছোট শিল্প-এলাকা থাকতে পারে। পুরো এলাকাতে শ্রম-নীতির ব্যাপক পরিবর্তনের প্রস্তাব রয়েছে— ইউনিয়ন বানানোর অধিকার সীমিত করা, অস্থায়ী শ্রমিক ব্যাপক হারে লাগু করার সুবিধা দেওয়া, কারখানায় প্রতি শিফট-এ কাজের সময় অনিয়ন্ত্রিত রাখা, শ্রমিকদের ছাঁটাই আরো সহজ করা ইত্যাদি। স্পষ্টত, যে কাজ এই শিল্পক্ষেত্রগুলিতে তৈরি হবে তার সিংহভাগ হবে অস্থায়ী ধরনের, অত্যন্ত কম মাইনের, ন্যূনতম সুরক্ষার। আধুনিক উৎপাদন শৃঙ্খলের অংশ হিসেবে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এইসব পুঁজি-নির্ভর শিল্পে শ্রম প্রক্রিয়ায় শোষণ-দমনের মাত্রাও অনেক বেশি হবে, যার একটা চিত্র আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। আর বলা বাহুল্য, সেক্ষেত্রে আরও ‘মারুতি’ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা মতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মারুতি আন্দোলন মালিক-সরকার-প্রশাসন-আইনব্যবস্থা-কর্পোরেট মিডিয়া-ভোটপার্টি-প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সাথে আজকের পুঁজিবাদের উন্নয়ন আর বিকাশের এই মডেলেরও স্বরূপ উন্মোচিত করেছে ও করছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মারুতি শ্রমিকরা যা করেছেন, তা সচেতনভাবে করার অর্থ হলো পুঁজিপতিদের শোষণ-দমনের এই পুরো ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রাম সংগঠিত করার লড়াইতে ভাগ নেওয়া। আর শুধু মারুতি শ্রমিক নন, সারা দেশের সংঘর্ষরত শ্রমিক আর বিপ্লবীদের কাছে এই চ্যালেঞ্জ আজ উপস্থিত।

বহরমপুর জেলে আবার মৃত্যু

৬ পৃষ্ঠার পর

বহরমপুর জেলে চিকিৎসা অপ্রতুল, যদিও জেল হাসপাতাল আছে। যথাযথ পরিকাঠামো নাই, স্থায়ী কোন স্বীকৃত চিকিৎসক মেলে না, সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরাই কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই নার্সের কাজ করেন। এপিডিআর বহরমপুর শাখা সিরাজুল শেখের মৃত্যুর পর ২০০২ সালে কারা-মন্ত্রীর পর্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়ে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।

বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে সব মিলিয়ে (সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন) ২২০০ জন বন্দি থাকার ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে আছেন প্রায় আড়াই হাজার বন্দি। আবার কয়েকটি সেলের এমন অবস্থা যে সেগুলোতে কোন বন্দি রাখা যায় না, ফলে প্রকৃতপক্ষে রাখা যেতে পারে মাত্র ১৭০০ বন্দি। বন্দিপিছু প্রতিদিন ২৫০ গ্রাম করে চাল/আটা ও ১০০গ্রাম করে মুড়ি ও সপ্তাহে মোট তিন দিন আমিষ জাতীয় খাবার (মাছ/মাংস/ডিম সপ্তাহে যার মোট পরিমাণ সর্বাধিক সোয়া দু'শো গ্রাম)। পুষ্টি এতে হবে কি?

আত্মহত্যা অথবা হত্যা যা-ই হোক না কেন, কারা-কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত বন্দিদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর দায় এড়াতে পারেন কি? মা-মাটি -মানুষের সরকারের প্রধান কী বলেন?

মিলন মালাকার

বই মেলায় পিবিএস-এর নতুন বই

দীপংকর চক্রবর্তী রচনা সংকলন

(প্রথম খণ্ড)

তসলিমা : গদ্যপদ্য

তসলিমা নাসরিন

কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকা

সুমিতা দাস

pbs

পিপলস বুক সোসাইটি

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট (দ্বিতল)

কলকাতা ৭০০০০৯, ফোন : (০৩৩) ২২১৯-৯২৫৬

প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বন্দি

বিশ্বজিৎ রায়

কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য রাজ্য-সরকারগুলির মতোই পশ্চিমবঙ্গের শাসকরাও রাজনৈতিক বন্দির তালিকা প্রকাশ্যে হাজির করেন না। তবে এ রাজ্যে বামফ্রন্ট আমলে জেল আইন সংশোধন করে রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং স্বীকৃতির ব্যবস্থা হয়। নাগরিক অধিকার আন্দোলনের চাপে এবং বাম রাজনীতির অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পুরনো জেল আইন বদলে ১৯৯২ সালে প্রণীত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট'-এ রাজবন্দির আইনে বন্দির আবেদনের ভিত্তিতে রাজবন্দি বা 'ডিভিশন ওয়ান' বন্দির স্বীকৃতিদানের ক্ষমতা আদালতের হাতে ন্যস্ত হলেও আইনি মাপকাঠির ভিত্তিতে কারাবিভাগের আইজি-কেও প্রাথমিকভাবে বন্দিকে এই মান্যতাদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। বকলমে ওটা সরকারি স্বীকৃতির ব্যবস্থা। কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন তথা গণসংগ্রামের শেকড়ে ফেরার তাড়না হারিয়ে ক্ষমতাই নয়নের মণি হয়ে ওঠার পর শাসক ধর্মে থিতু সিপিএম রাজনৈতিক বন্দির অস্তিত্ব স্বীকার করত না। দুই-একজন নেতা বাদ দিলে মধুলোভী শরিক দলগুলিও রাজনৈতিক প্রতিহিংসাজাত ধরপাকড়ে বন্দিদের নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলনের পর্বে জেলে জেলে বাম সরকার বিরোধী বন্দির সংখ্যা বাড়লে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দিমুক্তির দাবিতে গলা মেলান। এই বন্দিদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের পৃথক কামতাপুর এবং গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা ছাড়াও গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের কয়েকজন নেতা-কর্মীও ছিলেন। এছাড়া বেশ কিছু এসইউসিআই নেতা-কর্মী, যাদের অনেকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী কৃষক প্রতিরোধে যুক্ত ধৃত তৃণমূল সমর্থকদের সঙ্গে ছিলেন এসইউসিআই এবং বিভিন্ন নকশালপন্থী গোষ্ঠী সহ অপরাপর বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীরা। তবে রাজনৈতিক বন্দির সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ে লালগড় তথা জঙ্গলমহল আন্দোলন পর্বে। পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতৃত্বে সরকার ও শাসক দলের নিপীড়ন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতিরোধে এই গণবিস্ফোরণ হলেও একটা পর্বের পর তা মার্কসবাদী-মাওবাদী খুনোখুনিতে পর্যবসিত হয়। পুলিশের চর হিসেবে সন্দেহভাজন অথবা সিপিএম ও কমিটি সমর্থক হওয়ার অপরাধে বহু সাধারণ মানুষের প্রাণ যায়। কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ আধা-সামরিক বাহিনী ও শাসকদলীয় 'হার্মাদ' বাহিনী বনাম মাওবাদী এবং তৃণমূল সহ অন্যান্য সরকার-বিরোধীদের রক্তাক্ত যুদ্ধে লাশের সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে জেলবন্দির তালিকা। এদের একটি বড় অংশ সাধারণ আদিবাসী-মূলবাসী যুবক। মাওবাদী সন্দেহে ধৃতদের মধ্যে অন্তত শ'খানেকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহে উস্কানি, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইত্যাদি ফৌজদারি দণ্ডবিধিভুক্ত ধারা এবং অস্ত্র আইন, বিস্ফোরক আইন ছাড়াও ইউএপিএ আইন লাগু হয়। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস ভয়াবহ নাশকতায় লাইনচ্যুত হওয়ার জেরে দেড়শোরও বেশি যাত্রী প্রাণ হারানোর পর নির্বিচার ধরপাকড়, ভুয়ো সংঘর্ষ খুন, হাজতে অত্যাচার এবং নিবর্তনমূলক আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার বেড়ে যায়। জঙ্গলমহল আন্দোলনের দিনগুলোয় উচ্চকিত রাজনৈতিক চাপান-উতোর চলে। সিপিএম নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে মমতা-মাওবাদী আঁতাতের অভিযোগ তুলে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথবাহিনীর 'সন্ত্রাসবিরোধী' অভিযানের ন্যায্যতা প্রমাণে মুখর হয় এবং 'হার্মাদ'দের সহযোগে অত্যাচার, ধরপাকড় তথা পুলিশ-রাজ কায়েমের অভিযোগ উড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে মমতা জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার, 'হার্মাদ'দের গ্রেফতারি এবং শাসকীয় প্রতিহিংসায় ধৃত বন্দিদের মুক্তির দাবিতে সরব হন। মাওবাদীদের সঙ্গে তাঁর মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের বন্ধু, ভ্রাতৃ-সম্বোধনে প্রীতি জানিয়ে বিদ্রোহীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রীয় নেতা আজাদের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের দাবিও জানান তিনি। 'সামাজিক ফ্যাসিবাদী' সিপিএম ও যৌথবাহিনী-হার্মাদদের বিরুদ্ধে কিষেণজীর নেতৃত্বে মাওবাদীরাও মমতা ও তাঁর দলকে মিত্রজ্ঞানে সাহায্য করেছেন। সে সময়ের জঙ্গলমহলে সাংগঠনিক প্রতিপত্তিহীন মমতা ও তাঁর সহযোগীদের সভায় জনসমাগমের উদ্যোগ নেয় মাওবাদী প্রভাবিত জনসাধারণের কমিটি ২০১১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে। কমিটির জেলবন্দি নেতা ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে মমতা-দূতেদের আলোচনা ভেস্তে গেলে ছত্রধর নির্দল প্রার্থী হিসাবে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু বাম-বিরোধী ভোট ভাগের আশঙ্কায় মাওবাদী নেতৃত্ব ছত্রধরের পাশে দাঁড়াননি। বস্তুত জঙ্গলমহলে তৃণমূল এই নির্বাচনী পর্বে তাঁদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনই পেয়েছে। জনসাধারণের কমিটির জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে কমিটির সঙ্গে যুক্ত নকশালপন্থী ঘরানার তিনজনকে প্রার্থীও করেন মমতা।

বন্ধু যখন শত্রু

কিন্তু মমতা ক্ষমতায় আসার পর সমীকরণ দ্রুত বদলাতে থাকে। যে কথা মমতা ও মাওবাদী নেতৃত্ব আজ আর স্বীকার করবেন না এবং দুই শিবিরের ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরাও চুপ করে থাকবেন তা হল, পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাস সত্ত্বেও নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক বোঝাপড়ার তাগিদ দু-তরফেই ছিল। রাজনৈতিক

বন্দিমুক্তি প্রশ্নে মমতার অবস্থান এবং মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তি-আলোচনায় তাঁর উদ্যোগ দ্বিমুখী রাজনৈতিক কৌশলের অঙ্গ। সরকার-ঘনিষ্ঠ এবং বিরোধী মানবাধিকার কর্মীদের দাবিমতো নির্বাচনী ইস্তেহারে রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তির প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি। বদলে বন্দিরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার না প্রকৃতই শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী তা খতিয়ে দেখতে 'কেস টু কেস' পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শর্তসাপেক্ষ মুক্তির কথা বলেন। এভাবেই রাজনৈতিক অঙ্কের ভিত্তিতে বন্দিমুক্তির খুড়োর কলটি ঝুলিয়ে দেন। ক্ষমতায় এসে রিভিউ কমিটি গঠনের সময় আরও সাঙঘাতিক শর্ত জুড়ে দেন। মুক্তির যোগ্যতা বিচারের সময় জেলে থাকাকালীন বন্দীর আচরণ তো বটেই, মুক্তির পর তাঁর আচার-আচরণের সম্ভাব্য গতি-প্রকৃতিও বিবেচ্য থাকবে। কমিটির মাথায় একজন প্রাক্তন বিচারপতি এবং সদস্য হিসাবে দুই নেতৃস্থানীয় মানবাধিকার কর্মীকে নিলেও মানবাধিকার সংগঠনগুলি বা পরিবর্তনপন্থী বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সঙ্গে কোনও আলোচনা নতুন সরকার করেনি। বরং কমিটিতে সমসংখ্যক সরকারি আমলা ও পুলিশের কর্তাদের নিয়ে এসে এর কার্যকলাপের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে সরকারি উদ্যোগে মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তি-আলোচনার জন্য প্রস্তুতি কমিটিতে তিনজন মানবাধিকার কর্মী এবং অপরাপর সরকার-ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা ঠাঁই পেলেও অন্ধ্রের 'কমিটি অফ কনসার্নড সিটিজেনস'-এর শান্তি উদ্যোগের মতো বৃহত্তর নাগরিক সমাজের স্বাধীন এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রস্তুতিপর্ব এক্ষেত্রে ছিল না।

বন্দিমুক্তি ও শান্তি-উদ্যোগের রাজনীতি

সরকার-ঘনিষ্ঠ মানবাধিকার কর্মীবৃন্দ ও তাঁদের বিরোধীদের বিতর্কে বন্দিমুক্তি এবং শান্তি-আলোচনার ওতপ্রোত সম্পর্ক তথা মমতার দরকষাকষির দ্বিমুখী কৌশল নিয়ে কোনও আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। বিধানসভা ভোটের পর জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রশ্নে নয়া শাসকদল, তার 'ভৈরববাহিনী' বনাম মাওবাদীদের বিরোধ খুনোখুনিতে গড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা অন্য রাজ্যের জেলে বন্দি

১. লক্ষ্ণৌ জেল	: ৪ জন ('হুজি' সমর্থক সন্দেহে ধৃত। উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ, রাজমিস্ত্রি, জোগানদারের কাজে উত্তরপ্রদেশ যান)
২. ঘাটশিলা জেল	: ২৫ জন (বেশ কয়েকজন মহিলাসহ মাওবাদী সন্দেহে ধৃত। জঙ্গলমহলের বাসিন্দা)
৩. সরাইকেলা জেল	: চারজনের বেশি (মাওবাদী সন্দেহে ধৃত)

তথ্যসূত্র : *বন্দীমুক্তি কমিটির সংবাদ বুলেটিন*, জানুয়ারি ২০১৩।

জনসাধারণের কমিটির মূল দাবিসমূহ, অর্থাৎ বাম-শাসনপর্বে পুলিশি অত্যাচারের জন্য অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের শাস্তি, সমস্ত বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার এবং স্থানীয় উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ইস্যুগুলিতে সরকারি টালবাহানা ছিল ওই দ্বিমুখী দরকষাকষির কৌশলেরই অঙ্গ। শান্তি-উদ্যোগের পাশাপাশি জঙ্গলমহলে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর লাগাতার হুমকি, যৌথবাহিনী ও 'ভৈরব'দের তৎপরতা বৃদ্ধি, স্থানীয় যুবকদের স্পেশাল পুলিশকর্মী নিয়োগের ঘোষণা এবং নতুন করে জনসাধারণের কমিটির নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় পরিস্থিতি বিষিয়ে তোলে। ভৈরববাহিনীর সংগঠক এই অভিযোগে তৃণমূল নেতা-কর্মী এবং কমিটি-ত্যাগীদের হত্যা করে মাওবাদীরাও কর্তৃত্ব ধরে রাখার চেষ্টা চালান। শেষপর্যন্ত তারা একমাসের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেও তাতে কোনও লাভ হয়নি।

মাওবাদী নেতৃত্ব সম্ভবত চেয়েছিলেন জঙ্গলমহলে তাদের আধিপত্য মমতা মেনে নেন। যাতে ছত্তিশগড়-ঝাড়খন্ড-ওড়িশার আদিবাসী-প্রধান দুর্গম অঞ্চলে তাদের অভীষ্ট ঘাঁটি এলাকাগুলির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকে। বিনিময়ে তাঁরা মমতার এলাকায় সাংগঠনিক ও সামরিক তৎপরতা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু সিপিএমের মতোই সরকার ও শাসকদলের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর মমতা। তিনি বুঝে যান, মাওবাদীরা তার সহযোগী শক্তি হিসাবে জঙ্গলমহলের প্রান্তিক অঞ্চলে ছোটখাটো ক্ষমতার মধু পেয়ে সন্তুষ্ট হবে না। ফলে পুলিশ-শাসকদল যৌথ সশস্ত্র অভিযান বাড়ে। মাওবাদী-নেতৃত্ব

রাজ্যের জেলগুলিতে রাজনৈতিক বন্দিদের অসম্পূর্ণ তালিকা

মাওবাদী, পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি, আদিবাসী-মূলবাসী জনগণের কমিটির সদস্য-সমর্থক

১. মেদিনীপুর জেল	: ৬৫
২. প্রেসিডেন্সি জেল	: ২০ (১ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত)
২. দমদম জেল	: ৮ (২১ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত)*
৪. কৃষ্ণনগর জেল	: ১১ (২১ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত)
৫. বহরমপুর জেল	: ৮ (৪ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত)
৬. অন্যান্য জেল	: ৪
৭. মজিলা জেল	: ২

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম জেলের হিসেব পাওয়া যায়নি।

এস ইউ সি আই দলের সদস্য-সমর্থক

১. আলিপুর জেল	: ২৬ জন (যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত)
২. দমদম জেল	: ২০ জন

লস্কর-ই-তৈবা বা অন্যান্য জিহাদি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে ধৃত

বহরমপুর জেল	: ২

*এপিডিআর প্রকাশিত 'বন্দীকথা' শীর্ষক পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট তালিকা অনুযায়ী ৭ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দমদম জেলে রাজবন্দির সংখ্যা ১৯।

বুঝতে পারেননি অথবা বুঝতে চাননি যে সিপিএম-বিরোধিতার সূত্রে অর্জিত ঐক্যের জনভিত্তি ধ্বসে গেছে। যুদ্ধক্লান্ত আমজনতা নতুন সরকারকে সময় দিতে চায়। সরকারি বাহিনীর হাতে কিষেণজীর হত্যায় শান্তি-উদ্যোগের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

জঙ্গলমহলে একচ্ছত্র ক্ষমতা কায়েমের পথে কাঁটা একদা-বন্ধুদের নির্মম উচ্ছেদ এবং দীর্ঘতর কারাবাস সুনিশ্চিত করাই ছিল মমতার লক্ষ্য। এক্ষেত্রে অন্ধ্রের চন্দ্রবাবু নাইডু, ওয়াই এস আর রেড্ডি বা ওড়িশার নবীন পট্টনায়কের পথেই হেঁটেছেন তিনি।

রাজনৈতিক বন্দিমুক্তির প্রশ্নে শান্তি-উদ্যোগ এবং পরবর্তী সময়ে মমতা সরকারের সমস্ত পদক্ষেপের প্রেক্ষাপট এটাই। যাঁরা এ নিয়ে ঝেড়ে কাশছেন না, তাঁরা ভাবের ঘরে চুরি করছেন মাত্র। মানবাধিকারের রাজনীতি এবং রাজনীতি-বিযুক্ত মানবাধিকারের প্রবক্তারা সকলেই আড়ালে বন্দিমুক্তি ও শান্তি-উদ্যোগের আন্তঃসম্পর্ক স্বীকার করলেও প্রকাশ্যে এই 'রিয়েল-পলিটিক'টির অস্তিত্ব এড়িয়ে যান। কিন্তু আমরা এই আন্তঃসম্পর্কটির উপর জোর দিচ্ছি। এর মানে এটা নয় যে সরকারের সঙ্গে আপসে না গেলে সমালোচক-বিরোধীদের রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে না বা তাঁদের জেলে পচিয়ে মারা ন্যায্য। বরং শাসকীয় রাজনীতির ভণ্ডামি, সরকার-মুখাপেক্ষী নাগরিক সক্রিয়তার সুবিধাবাদ, পাশাপাশি বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে সংসদীয় বিরোধী দলগুলির সমঝোতার ফাঁদ ও মতাদর্শগত অন্ধতা কীভাবে মানবাধিকার ইস্যুগুলিকে আবিল করে তোলে, অনতি-অতীতের ইতিহাস তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে।

রিভিউ কমিটি

নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের আগেই তদানীন্তন মুখ্যসচিব সমর ঘোষের কাছে এক চিঠিতে এপিডিআর ৪৮৩ জন রাজনৈতিক বন্দির তালিকা দিয়ে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানায়। চিঠিতে এটাও বলা হয়, তালিকাটি অসম্পূর্ণ এবং রাজ্য কারা দফতরের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা। পূর্বতন সরকারের আমলে আদালতের মাধ্যমে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাজবন্দির সংখ্যা অপ্রতুল, এ কথা উল্লেখ করে নতুন সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের আশা জানিয়ে রাজ্যে শান্তি ও সুবিচারের স্বার্থে মানবাধিকার সংক্রান্ত ইস্যুগুলিতে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটি বৈঠকের জন্য 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট'ও চায় স্বাধীনতোত্তর ভারতে এ রাজ্যের তথা দেশের সবচেয়ে পুরনো মানবাধিকার সংগঠনটি। অপর প্রধান মঞ্চ বন্দিমুক্তি কমিটি কোনোও তালিকা না পেশ করলেও তার সম্পাদকের হিসেব মতো রাজবন্দির তৎকালীন সংখ্যা ছিল ছশোর কাছাকাছি। কিন্তু নতুন সরকার এপিডিআর ও বন্দীমুক্তি কমিটি সহ অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনগুলিকে কোনও বৈঠকে ডাকেনি। তবে মমতা-ঘনিষ্ঠতার সুবাদে এপিডিআর-এর দুই প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং বন্দীমুক্তি কমিটির সম্পাদক সহ কয়েকজন সক্রিয় পরিবর্তনপন্থী বুদ্ধিজীবী রিভিউ কমিটি ও শান্তি-উদ্যোগে যুক্ত হন ব্যক্তিগতভাবে। এরা আবার সকলেই 'ফ্রেন্ডস অব ডেমোক্র্যাসি' নামে সংগঠনের সদস্য, যারা নির্বাচনে 'নো টু সিপিএম' ডাক দিয়ে তৃণমূলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নামেন। নিঃশর্ত মুক্তির দাবি মমতার ইস্তাহারে আমল না পাওয়ার জেরে মমতা-ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর সঙ্গে দূরত্ব রাখায় পক্ষপাতী মানবাধিকার কর্মীদের মতাবিরোধ বাড়ছিল। রাজনৈতিক ধারার বিচারে দুপক্ষেই অনেকে নকশালবাড়ীর ধারার অনুগামী। বামফ্রন্ট ভুক্ত দলগুলি তথা সাধারণভাবে বামপন্থী মতাদর্শ-রাজনীতির আবহে বেড়ে ওঠা শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলের মতোই মানবাধিকারে আন্দোলনেও ফাটল ধরে মমতা ও তাঁর দল এবং নতুন সরকারের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে। রিভিউ কমিটির টার্মস অব রেফারেন্স বা বন্দিমুক্তির শর্তাদি এবং কমিটি গঠন নিয়ে বিতণ্ডা এই ফাটলকে গভীর করে তোলে।

'ফ্রেন্ডস অব ডেমোক্র্যাসি' ও তার সহগামীরা নিরঙ্কুশ জনাদেশে অভিষিক্ত নতুন সরকারকে সময় দেওয়ার পক্ষে এবং শর্ত-কণ্টকিত রিভিউ কমিটির মাধ্যমেই রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি ত্বরান্বিত করায় আস্থা রাখেন। তাঁদের বিরোধীরা প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের রাজবন্দীদের নিঃশর্তে মুক্তির সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি চাইলে গণতন্ত্রের বন্ধুরা পাল্টা প্রমাণের চেষ্টা করেন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন ভিন্ন ছিল এবং ঐ পর্বেও সব বন্দি ছাড়া পেতে দেড়-দুবছর লেগে গিয়েছিল। এ দফায় মুক্তির যোগ্যতা বিচারে বন্দির ভবিষ্যত রাজনৈতিক আচার-আচরণের নিক্তি ওজন অপমানজনক এবং মুচলেকা-মুক্তির সামিল, পাকেপ্রকারে তা স্বীকার করেও মমতা-ঘনিষ্ঠরা এর দায় চাপান আমলা-পুলিশকর্তাদের ঘাড়ে। পরবর্তী মাসগুলিতে রিভিউ কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও রাজনৈতিক বন্দিদের স্বীকৃতির প্রশ্নে বিলম্ব, এমনকি সরকারপক্ষীয় উকিলদের বিরোধিতার নেপথ্যে বাম-আমলের আইনে আদালতে ন্যস্ত ক্ষমতা ও সিপিএম শিবির-ভুক্ত পাবলিক প্রসিকিউটরদের অন্তর্ঘাত এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতাকেই তাঁরা দায়ী করেছেন। শান্তি-উদ্যোগ ভেস্তে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়দায়িত্বের প্রশ্নেও তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকাকে এড়িয়ে গিয়েছেন।

সরকারি সূত্র মোতাবেক, কারা দফতর রিভিউ কমিটির কাছে ২০১১ সালের মাঝামাঝি ৭৯ জন বিচারাধীন রাজবন্দির তালিকা হাজির করে যারা আদালতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। এদের সংখ্যাগুরুই উত্তরবঙ্গের। ৪৪ জন কোচবিহারে এবং ১৭ জন আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলে। সকলেই গ্রেটার ও কামতাপুরী আন্দোলনের কর্মী। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের কৃষ্ণনগর জেলে বন্দী ১২জন এবং প্রেসিডেন্সি, দমদম ও মেদিনীপুর

জেলে বন্দি ৬ জন মূলত সন্দেহভাজন মাওবাদী হিসেবে অভিযুক্ত। রিভিউ কমিটি প্রথম দফায় ৭৮ জন বন্দির মুক্তির সুপারিশ জানালেও সরকারিভাবে তা কাটছাঁট করে ৫২ জনের তালিকা তৈরি হয়। ২০১১ সালের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এদের জামিনে মুক্তিদানের কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘোষণা করলেও তালিকাভুক্ত ২ জন মাওবাদী নেতা-কর্মী, চণ্ডী সরকার ও প্রদীপ চ্যাটার্জীকে ছাড়া হয়নি। বয়োবৃদ্ধ চণ্ডীবাবু অনেক পরে আদালত থেকে ছাড়া পান। প্রদীপ এখনও জেলে। বাকি ৫০ জন উত্তরবঙ্গের দুই আন্দোলনের কর্মী এবং মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। বাম-আমলে রাজবংশীদের এথ্‌নিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং রাজনৈতিক স্বশাসনের আন্দোলন সরকারি প্রতিকূলতার মুখে পড়ে। কেএলও সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে সিপিএম নেতা-কর্মীদের খুনও করে। কিন্তু পরিবর্তিত পটভূমিতে দার্জিলিং-এ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মতোই উত্তরবঙ্গের সমতলে আত্মপরিচিতির আন্দোলন-সংগঠনগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে মমতা এদের মুক্তি দেন। তবে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে গেলে বা এথ্‌নিক আন্দোলন বঙ্গ ভঙ্গের দাবিতে সোচ্চার হলে তিনিও যে সিপিএমের পথে হেঁটে পুলিশি দমন-পীড়নের অস্ত্র প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত তা পাহাড়ের সাম্প্রতিক গোর্খা জন মুক্তি মোর্চার নেতা-কর্মীদের পুরনো মামলায় গ্রেফতারিতে স্পষ্ট।

কিন্তু মাওবাদী এবং তাঁদের সহযোগী জনসাধারণের কমিটির নেতাদের সঙ্গে মমতার কোনও রাজনৈতিক সমঝোতা না হওয়ায় শান্তি-উদ্যোগের মধ্যপথে মুক্তির তালিকাভুক্ত দুই মাওবাদী বন্দিকে তিনি ছাঁটাই করে দেন কেন্দ্রীয় সরকারের দোহাই দিয়ে। রিভিউ কমিটি দুদফায় সমস্ত বিচারাধীন ও দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির সুপারিশ করলেও তিনি মাওবাদী সন্দেহে বন্দিদের ক্ষেত্রে কমিটির মতামতে আজ পর্যন্ত কোনওরকম আমল দেননি। তাঁর নিজের রাজনৈতিক অঙ্ক মেনে তিনি সেটুকু সুপারিশই মেনেছেন যা তাঁর দল ও সরকারের আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ এবং জনভিত্তিকে সংহত করবে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে মমতার সঙ্গী এবং পরবর্তীকালে লোকসভা নির্বাচনে জোট-শরিক এসইউসিআই সিপিএম জমানায় পুলিশি দমনপীড়নের নিত্য শিকার ছিল। এই দলের ৫৪ জন নেতা-কর্মী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইউপিএ সরকারে যোগদান ও কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে এসইউসিআই জোট থেকে সরে এলেও মমতা-জমানায় সুন্দর চ্যাটার্জী সহ দলের কয়েকজন নেতা-কর্মী মুক্তি পেয়েছেন। এছাড়া সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে 'ম্যাজিস্ট্রেট ট্রায়াল' এবং 'সেসন্‌স ট্রায়াল' তথা সাধারণ হাঙ্গামা, অবৈধ জমায়েত ইত্যাদির মামলায় অভিযুক্তদের সঙ্গে খুন-জখম ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগে বন্দিদের জামিনে মুক্তি এবং কেস প্রত্যাহারেও সরকারি তৎপরতা দেখা গিয়েছে। কারণ যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকে সামনে রেখে মমতার ক্ষমতাপ্রাপ্তি, সেখানকার আন্দোলনকারীরা জেলে থাকলে সরকারের রাজনৈতিক বিড়ম্বনা। দ্বিতীয়ত, এই দুই জায়গাতেই তৃণমূলের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ এখনও অটুট। রিভিউ কমিটির সুপারিশ মেনে সরকার বৃদ্ধ, অশক্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের অনেককে মুক্তি দিয়েছে। পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হিসেবে এই মুক্ত অরাজনৈতিক বন্দিদের সংখ্যা ১৮০।

দুয়োরাণীর ছেলেমেয়েরা

পক্ষান্তরে লালগড় তথা জঙ্গলমহলে মাওবাদী এবং একদা ছত্রধর মাহাতোর নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের কমিটির বন্দি নেতা-কর্মীরা দুয়োরাণীর সন্তান। কমিটির সঙ্গে তৃণমূলের আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্বে রিভিউ কমিটির সামনে জঙ্গলমহলের বন্দিদের মামলাগুলি বিবেচনার জন্য হাজিরই করেনি সরকারপক্ষ। ২০১১-এর ডিসেম্বরে কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্টের আগে সরকারি নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে, কমিটি ৭৮ জন স্বীকৃত রাজবন্দির মুক্তিসহ মোট ৬৬৫টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে। এতে সিঙ্গুরের ১০৮টি, নন্দীগ্রামের ৪৭৬টি এবং আলিপুর সেসন্‌স কোর্টের তিনটি বিচারাধীন মামলার উল্লেখ থাকলেও লালগড় বা জঙ্গলমহল মামলাগুলির কোনও উল্লেখ নেই। ওয়াকিবহাল সূত্রের হিসেবে জনসাধারণের কমিটির প্রায় ২০০০ সমর্থক বিভিন্ন মামলায় বন্দি বা জামিনপ্রাপ্তির পর কেস কানেকশনে অন্য মামলায় হাজতে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মুক্তির প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়নি রাজনৈতিক কারণেই। মাওবাদীদের সঙ্গে সরকারের শান্তি-উদ্যোগ শুরু থেকেই টলমল পায়ে হাঁটছিল। ২৪ নভেম্বর কিষেণজির হত্যায় তা মুখ থুবড়ে পড়ে। রিভিউ কমিটির ডিসেম্বরের অন্তর্বর্তী রিপোর্টে তাই সন্দেহভাজন মাওবাদী এবং জনসাধারণের কমিটির সাধারণ সমর্থকদের মুক্তির প্রসঙ্গ অনুপস্থিত, কমিটি সদস্য সরকারপক্ষীয় এক আমলার ব্যাখ্যা এমনটাই। কমিটির অন্তর্বর্তী এবং ২০১২-র আগস্টের চূড়ান্ত রিপোর্ট, কোনটাই আজও জনসমক্ষে না আসায় ছত্রধর মাহাতোসহ জঙ্গলমহলের বন্দিদের মুক্তি এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের প্রশ্নে কমিটির সুপারিশ ও সরকারি সিদ্ধান্ত আমরা জানতে পাইনি। ইতিমধ্যে ছত্রধর আদালতে রাজবন্দির মর্যাদা পেয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে রুজু ৩২টি মামলায় জামিন এবং একটিতে খালাসপ্রাপ্ত ছত্রধরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহে উস্কানির অভিযোগ ঝাড়গ্রামের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও ২০০৯-এর সেপ্টেম্বরে ধৃত ছত্রধর ও তাঁর সঙ্গী সুখশান্তি বাস্কে প্রমুখ আজও বন্দি। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে ছত্রধরের সঙ্গে লালগড়ে এক জমায়েতে হাজির সেদিনের

বিরোধী নেত্রী তথা আজকের মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ-প্রশাসন ছত্রধরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের চার্জ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেয় এবং রাজবন্দির মর্যাদা চেয়ে আদালতে তাঁর আবেদনের বিরোধিতা করেন।

রিভিউ কমিটি তিহার জেলে বন্দি মাওবাদী দলের পলিটব্যুরো সদস্য কোবাদ গান্ধীর এক চিঠির ভিত্তিতে পশ্চিমবাংলায় একটি মামলায় এফআইআর-এ অভিযুক্তের তালিকা (শালবনি থানা, কেস নম্বর ৮১/২০০৮, আইপিসি ধারা ১২১/১২১এ/১২৩) থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ জানায়। একদা আজাদ হত্যার তদন্তের দাবিতে গলা-মেলানো বিরোধী নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী সুপরিচিত বুদ্ধিজীবী গান্ধীর ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ কার্যকর করেছেন, এমনটা জানা নেই। যদিও কোবাদের চিঠিকেই সরকারি রিভিউ কমিটির প্রতি মাওবাদী নেতৃত্বের আস্থার বিজ্ঞাপন হিসাবে তুলে ধরতেন কমিটির বেসরকারি সদস্যরা।

শুধুমাত্র আইনি প্রক্রিয়ার দোহাই দিয়ে সরকার হাত গুটিয়ে রাখলে মমতার বন্দিমুক্তির রাজনীতির ছকটা তত স্পষ্ট হত না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের কয়েকমাস আগে জঙ্গলমহলে তৃণমূলের উদ্যোগে একটি মুচলেকা-পত্রের 'প্রোফর্মা' বিলি হয়। তাতে বাম-জমানায় বন্দি জামিন পেলেও মামলায় জেরবার অভিযুক্তদের অব্যাহতির আবেদনে লিখতে হয়েছে যে তাঁরা 'গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছেন'। রাজ্যজুড়ে বিপুল জনাদেশে জয়ী হওয়ার পরও জঙ্গলমহলে রাজনৈতিক আনুগত্য আদায়ের এই নির্লজ্জ প্রয়াসে স্পষ্ট, জয় করেও ভয় যায়নি মমতার। এই মুচলেকা-পত্রের ভিত্তিতে এবং অন্যবিধ উপায়ে চাপের কাছে নতি-স্বীকার করে জনসাধারণের কমিটির বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী জামিন পেয়েছেন। প্রত্যাশিতভাবেই তাঁরা অনেকেই আজ জঙ্গলমহলে তৃণমূলের নেতা। একসময়ে সাড়া-জাগানো মাওবাদী স্কোয়াড নেত্রী সদস্যসহ বেশ কয়েকজন আত্মসমর্পণ করে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যর্থনাও পেয়েছেন। অর্থাৎ শাসক-শিবিরে যোগ দিলে মুক্তি পাবে, নতুবা জেলে পচে মরবে।

প্রশ্ন করলেই মাওবাদী

অন্যদিকে মাওবাদী অভিযোগে ধরপাকড় চলছে। নতুন করে ইউএপিএ আইন প্রয়োগ হচ্ছে এবং তা শুধু শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী নেতা বলে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কলকাতার নোনাডাঙ্গায় ঝুপড়িবাসীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে মিছিল-ধরনা পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করেই থেমে থাকেনি মা-মাটি-মানুষের সরকার। 'অস্ত্র-বোমা জড়ো করে সরকার বিরোধী নাশকতা'র চক্রান্তের অভিযোগে পুলিশি হাজত ও কারাবাস করতে হয়েছে সিঙ্গুর আন্দোলন পর্বে মমতার সহযোগী নকশালপন্থী কর্মীদেরও। নন্দীগ্রামে তৃণমূল-মাওবাদী ষড়যন্ত্রের নায়িকারূপে সিপিএমের প্রচারে বারংবার উল্লিখিত মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতির নেত্রী দেবলীনা চক্রবর্তী গ্রেফতার হন নোনাডাঙ্গা-বিক্ষোভ পর্বে। রাজদ্রোহে ও রাষ্ট্রবিরোধী যুদ্ধের দায়ে অভিযুক্ত দেবলীনা দীর্ঘ কয়েকমাস পর জামিনে ছাড়া পেলেও পরে ধৃত তার সহযোগী জয়িতা দাস আজও বন্দি— মাওবাদী ষড়যন্ত্রের অভিযোগেই। বস্তুত, নোনাডাঙ্গা থেকে বেলপাহাড়ি, নতুন শাসককে প্রশ্ন করার স্পর্ধা দেখালেই মাওবাদী হিসেবে হাজত ও কারাবাস নিশ্চিত। কামদুনিতে ধর্ষণবিরোধী স্থানীয় মহিলাদের বিক্ষোভের নেপথ্যেও মাওবাদী প্ররোচনার ভূত দেখতে পেয়েছেন একদা বিরোধী নেত্রী তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। সরকার পরিবর্তনের দু'বছরের মধ্যেই মাওবাদী-সিপিএম আঁতাতের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। যা ছিল তাঁর বিরুদ্ধে সিপিএম-এর প্রচারের বর্শামুখ, তাই তিনি ঘুরিয়ে দিচ্ছেন আজকের বিরোধী পক্ষের দিকে।

গত দুবছরে সরকারি বিরোধিতা সত্ত্বেও জনা কুড়ি মাওবাদী অভিযুক্ত আদালত থেকে রাজনৈতিক বন্দির স্বীকৃতি পেয়েছেন। এর মধ্যে মাওবাদী মুখপাত্র বলে পরিচিত গৌর চক্রবর্তী, ছত্রধর মাহাতো, সুখশান্তি বাস্কে, প্রসূন চ্যাটার্জি, সগন মুর্মু, শম্ভু সোরেন ও ভেঙ্কটেশ্বর রেড্ডি স্বীকৃতি পান কলকাতা হাইকোর্টের ২০১২-র ৮ আগস্টের রায়ে। ২১ সেপ্টেম্বরে 'সেশন্‌স কোর্টে' এই স্বীকৃতি পান আরও নয়জন। এর মধ্যে রয়েছেন মাওবাদীদের সামরিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত কমিটির প্রধান বলে অভিযুক্ত সাদানালা রামকৃষ্ণ। হাইকোর্ট রাজবন্দি ও সাধারণ বন্দিদের মধ্যে পার্থক্য এবং তদনুযায়ী সুযোগসুবিধা বরাদ্দের ব্যবস্থাকে বৈষম্যমূলক বললেও বিদ্যমান আইনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কৃত অপরাধে অভিযুক্ত হিসাবে ঐ বন্দিদের রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেন। শুধু তাই নয়, বেআইনি রাজনৈতিক কার্যকলাপে অভিযুক্তকেও ওই রাজবন্দির মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এপিডিআর, পিইউডিআর সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এই রায়কে মোটের উপর স্বাগত জানায় এবং রাজ্য আইনে বর্ণিত রাজবন্দির সংজ্ঞা মেনে সরকারকে অপরাপর সমগোত্রীয় বন্দিদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ স্বীকৃতিদানে উদ্যোগী হওয়ার দাবি করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'রাজনীতি'র সীমা ও সংজ্ঞাকে বাড়িয়ে রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিবাদ-প্রতিরোধকেও ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য রাজনীতি রূপে স্বীকৃতির দাবি এই রায়ে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হলো বলে মনে করছেন তাঁরা। অন্যদিকে জেলে বন্দিদের সুযোগ-সুবিধায় সমানাধিকার দানে আদালতের নির্দেশে সমর্থন জানালেও 'রাজনৈতিক' ও 'রুটিন' অপরাধের সীমা ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাবে তারা একমত হননি।

প্রতিপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার আদালতের সিদ্ধান্তে প্রমাদ গণে। কেন্দ্র-রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তথা 'মাওবাদী

এবং জিহাদি সন্ত্রাস দমনে' ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা-পুলিশ কর্তারা রায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁদের আশঙ্কা, এর ফলে দুই গোত্রের সন্ত্রাসবাদীরাই আইনি মান্যতা পাবে এবং এদের মুক্তির পথ সহজ হয়ে উঠবে। টাডা-পোটা, স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট, আর্মর্ড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট এবং অধুনাতম ইউএপিএ ইত্যাদি হাজার গন্ডা সন্ত্রাস ও উগ্রপন্থা বিরোধী আইনে অভিযুক্ত বন্দিদের অধিকাংশই নিরপরাধ সাধারণ নাগরিক— এ তথ্য বারংবার আদালতে প্রমাণিত হলেও 'কড়া রাষ্ট্রে'র প্রবক্তা তথা জাতীয় নিরাপত্তার অভিভাবকরা কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের অভিঘাত আটকাতে তৎপর হন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ঐ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে। ইউপিএ-ত্যাগী মমতা নানা ইস্যুতে কেন্দ্র-বিরোধিতায় কম্বুকণ্ঠ হলেও এক্ষেত্রে কেন্দ্রের সহগামী। রাজ্য সরকারের পক্ষে শীর্ষ আদালতে অভিযোগ— 'হাইকোর্টের রায়ে সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষিত সংগঠনের সক্রিয় সদস্যদেরও রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা প্রাপ্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর জেরে এবছর ৯ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে।

রাজবন্দির সংজ্ঞাবদল

আদালতে আইনি যুদ্ধেই থেমে থাকেনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় প্রণোদনায় এবং রাজ্যের উদ্যোগে এবছর আগস্টে ওয়েস্ট বেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট-এ রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞা আমূল বদলে সংশোধনী আইন পাস হয়েছে রাজ্য বিধানসভায়। এই আইনে সন্ত্রাসবাদী ও তাদের সংগঠনের কোনও সংজ্ঞা দেওয়া না হলেও রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞা থেকে 'নিষিদ্ধ, তালিকাভুক্ত ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এবং সমগোত্রীয় সংগঠনের সদস্য-সমর্থকদের' বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই সংজ্ঞা শুধু 'গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং গণবিক্ষোভের' সূত্রে ধৃতদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর এই তিন ধরনের আন্দোলনের চরিত্রলক্ষণ হবে 'মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা এবং সামাজিক সংস্কার'। এভাবে বাম আমলের আইনে বিধৃত রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞা এবং তার ব্যাখ্যার উদার গণতান্ত্রিক চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে তার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়েছে। পুরনো আইনের ছয় নম্বর ধারার 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার'দের রাজবন্দির মর্যাদা দানের ব্যবস্থা ছিল। সিপিএমের বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘ ক্ষমতা-যুদ্ধে মমতা অহর্নিশ এহেন শাসকীয় প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছেন,

গোটা দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তিদানের দাবিতে কো-অর্ডিনেশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস অর্গানাইজেশনস (সি ডি আর ও) আহূত কলকাতা কনভেনশনে (ফেব্রুয়ারি, ১৩) গৃহীত প্রস্তাবের দাবিসমূহ :

১. আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট, আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট, সিডিশন অ্যাক্ট এবং পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইত্যাদি বাতিল কর। সিপিআই (মাওবাদী) সহ বিভিন্ন সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নাও।

২. কুড়ানকুলামে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের নেতা-কর্মীবৃন্দ, জল-জঙ্গল-জমিন রক্ষার গণআন্দোলনগুলির নেতৃবৃন্দ— দয়ামণি বারলা, ড. সুনীলম, বিনায়ক সেন, সীমা ও বিশ্বজিৎ আজাদ, অরুণ ফেরেইরা প্রমুখদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহে উস্কানির মামলা প্রত্যাহার করো।

৩. গুরগাঁওয়ে মারুতি কারখানা থেকে আসানসোলে সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠনগুলির নেতা-কর্মীদের উপর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করো।

৪. জনসাধারণের কমিটি নেতা ছত্রধর মাহাতো, সত্তরোর্ধ এসইউসিআই নেতা প্রবোধ পুরকায়েত, সত্তরোর্ধ মাওবাদী নেতা নারায়ণ সান্যাল, সুশীল রায়, গৌর চক্রবর্তী, পতিতপাবন হালদার সহ সমস্ত রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তি চাই।

৫. সমস্ত বিচারাধীন বন্দীর মামলা রাষ্ট্রপুঞ্জ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গাইডলাইন মেনে পর্যালোচনা করতে হবে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংশোধন করে দ্রুত বিচার এবং জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. মৃত্যুদণ্ড বাতিল করো।

৭. জম্মু কাশ্মীর সহ সর্বত্র ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা, সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে ধর্ষণ, অত্যাচার ও মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের অত্যাচার-বিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন লাগু করতে হবে।

৮. জম্মু-কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব ভারত, মধ্যভারতের আদিবাসী প্রধান অঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল থেকে ভারতীয় যৌথ ও আধা-সামরিক বাহিনি প্রত্যাহার করতে হবে।

৯. সালওয়া জুড়ুম এবং অপরাপর সরকার-সমর্থিত বেসরকারি সেনা ভেঙ্গে দিতে হবে।

১০. তথাকথিত উন্নয়নের নামে সমস্ত উচ্ছেদ বিস্থাপন বন্ধ করো।

১১. মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও থেকে পশ্চিমবঙ্গের মালদা পর্যন্ত গোটা দেশ জুড়ে সন্ত্রাস-সম্পর্কিত ভুয়ো মামলায় অভিযুক্ত নিরীহ মুসলিম যুবকদের মুক্তি চাই।

১২. একদা বন্দিমুক্তির পক্ষে এবং ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার বিরুদ্ধে কম্বুকণ্ঠ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় বিরোধী মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্রমাগত সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হও।

যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল অতীব ন্যায্য। কিন্তু শাসকের গদিতে বসেই তিনি আইন থেকে ওই শব্দগুলিকেই মুছে ফেললেন। যেন তাঁর রাজত্বে রাজরোষে বন্দিদশার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। পুরনো আইনে 'ব্যক্তিগত লোভ ও অন্যান্য মতলব ছাড়া রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে কৃত অপরাধকে রাজনৈতিক অপরাধ' বলে গণ্য করা হয়। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক অপরাধের সীমা বাড়িয়ে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত সকল অপরাধ তথা 'রাজদ্রোহে উস্কানি, রাষ্ট্রবিরোধী যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র' ইত্যাদি অপরাধকে রাজনৈতিক অপরাধের আওতায় আনা হয়। এমনকি সাধারণ খুন-জখম, ধর্ষণ ইত্যাদির অভিযোগও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলে অভিযুক্তকে রাজবন্দির মর্যাদা প্রাপ্তির সুযোগ দেওয়া হয়। রাজনৈতিক অপরাধের শ্রেণী-বিশ্লেষণকে মাথায় রেখে এবং অতীতে ক্ষমতাসীনদের হাতে নির্যাতিত ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন তথা গরীব মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, মানবাধিকার রক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা- সম্পর্কিত স্বার্থরক্ষা ও অধিকারের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত আন্দোলনে-সংগঠনগুলিকে 'গণতান্ত্রিক' বলে অভিহিত করা হয়।

নেতৃস্থানীয় মানবাধিকার কর্মী গৌতম নভলাখা সম্প্রতি জানিয়েছেন, প্রয়াত কে জি কান্নাবীরনের মতো প্রবীণ আইনজ্ঞ এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতার পরামর্শ মেনে পশ্চিমবঙ্গের জেল আইনে রাজবন্দির সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা নির্ধারিত হয়। বামফ্রন্ট সরকার তার নিজের আইনে বর্ণিত এই উদার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা মেনে সরকার-বিরোধী বন্দিদের মর্যাদা দেয়নি। কিন্তু মমতা সরকারের সংশোধনী এই রাজ্য আইনে রাজবন্দির বিস্তৃত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সবটা মুছে দিয়ে নাগরিক অধিকার তথা গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের অর্ধশতাব্দীর তিল তিল অর্জনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ক্ষমতাসীন তৃণমূলের নিরঙ্কুশ দলতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে এই সংশোধন শুধু একদা-বন্ধু মাওবাদীকুলই শুধু নয়, অপরাপর বিরোধীদেরও অগণতান্ত্রিক বলে ছাপ্পা মারার ব্যবস্থা করেছে। মজা হচ্ছে, বিধানসভায় সিপিএম তথা অন্যান্য বামশরিকরা এহেন অভিযোগ জানালেও এই সংশোধনীটির নাম কা ওয়াস্তে বিরোধিতা করেই তাঁরা ক্ষান্তি দেন। ক্ষমতায় ফিরতে পারলে এই সংশোধনের জোরে জ্ঞাতিশত্রু মাওবাদী এবং অপরাপর বৈরিদের মোকাবিলা সহজ হবে, সিপিএম নেতৃত্বের এমন অঙ্কই সম্ভবত ফ্রন্টের নমোনমো বিরোধিতার নেপথ্যে। কিন্তু তার আগে এই সংশোধনীর ফল তাঁদেরও ভুগতে হবে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব তথা মন্ত্রীরা অভয় দিয়েছেন : সংসদীয় গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে বিশ্বাসীদের কোনও ভয় নেই। একদিকে রাজনৈতিক বন্দিদের স্বীকৃতির মূলে কুঠারাঘাত, অন্যদিকে বিচারাধীনদের দ্রুত বিচার এবং জামিনের দাবিতে কর্ণপাত না করা— দুইয়ে মিলে বছরের পর বছর পর জেলে পচিয়ে মারার ব্যবস্থা পাকা।

রাজ্যের জেলগুলিতে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক মিলিয়ে দশবছর পর্যন্ত বিচারাধীন বন্দি অগণ্য। কারা দপ্তরের ওয়েবসাইটের হিসেবেই বলছে ৫ বছরের বেশি বন্দি ২৬৩ জন। তিন থেকে পাঁচ বছর— ৭২৫ জন। এটা ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরের হিসেব। গত বছর জুলাই-আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর জেলে এবং তার আগে কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর

রিভিউ কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্ট এবং সুপারিশের (ডিসেম্বর ২০১১) সংক্ষিপ্তসার

কমিটি বিভিন্ন কারণে জেলে আটক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির সুপারিশ করছে। পর্যায়ক্রমে মুক্তির পদ্ধতির ক্ষেত্রে সুপারিশ এরকম: প্রথমে অবিলম্বে জামিন এবং পরে সকল রাজবন্দির বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার এবং ইতিমধ্যে আইনি সংজ্ঞার ভিত্তিতে আইজি(কারা)-কে দ্রুত অন্তর্বর্তীকালীন স্বীকৃতি দিতে অনুরোধ। কমিটির প্রথম ছয়মাসের মেয়াদপর্বে (তিনি কজনকে এমন স্বীকৃতি দিয়েছেন তার কোনও তালিকা বা সংখ্যা অবশ্য অনুল্লিখিত) সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে (শেওনন্দন পাসওয়ান এবং রাজেন্দ্র কে জৈন মামলা, ১৯৬৩) মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে রাজ্য ডিরেক্টর অব প্রসিকিউশনকে অনুরোধ করা হচ্ছে। আদালত-স্বীকৃত ৭৮ জন রাজবন্দীর অবিলম্বে জামিনে মুক্তি এবং তাঁদের ক্ষেত্রে মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে সরকারকে বিবেচনার সুপারিশ। আলিপুর জেলে বন্দি তিন বন্দি গৌরহরি মণ্ডল, রাধেশ্যাম গিরি এবং সঞ্জয় মান্ডি ওরফে প্রকাশ নুনিয়া-র ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী জামিন ও মামলা প্রত্যাহারের জন্য কমিটির সুপারিশ। এ হেন সুপারিশ সত্ত্বেও বহু কেন্দ্রে জামিনে মুক্ত অভিযুক্তদের আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র দফতরকে অনুরোধ, তাদের যেন পরবর্তী সিদ্ধান্ত পর্যন্ত ওই হাজিরা না দিতে হয়। এ পর্যন্ত রাজবন্দির স্বীকৃতি চেয়ে ১৫০টি আবেদন এসেছে। আরও কিছু আসছে। সংশ্লিষ্ট মামলাগুলির বিশদ চেয়ে পাঠানো হয়েছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য মামলাগুলি প্রত্যাহারে সুপারিশ। নন্দীগ্রামে সম্পত্তি নষ্ট সংক্রান্ত ৭৫টি দায়রা মামলার মধ্যে ২৮টি প্রত্যাহারের পরামর্শ। বাকি ৪৭টিতে আরও পর্যালোচনা। শারীরিক আঘাতে ইত্যাদি সংক্রান্ত ৯৭টি দায়রা মামলার মধ্যে আইনে বাধা না থাকলে ২৭টির ক্ষেত্রে প্রত্যাহার, ৫২টিতে আরও পর্যালোচনা। ১২টিতে পুলিশ (তথ্যপ্রমাণ না দিতে পারায়) ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়ায় মামলাগুলি তুলে নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য। ছয়টি মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত সিবিআই ও সিআইডির তদন্ত রিপোর্ট পেলে সিদ্ধান্ত হবে। অন্য ৩০টি সেসন মামলার ১৩টি প্রত্যাহার এবং বাকি ক্ষেত্রে আরও খতিয়ে দেখার সুপারিশ।

জেলে বন্দিদের অনশন-আন্দোলন বিচারবিভাগ বা সরকার, কারও ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনি। প্রেসিডেন্সিতে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক বন্দিদের অনশন পর্বে বন্দিমুক্তি কমিটি এবং এপিডিআর-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন জেল কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি পাঠান কমিশন প্রধান তথা সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোককুমার গাঙ্গুলি। বিনা বিচারে আটক রাখা ও বিচারে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বন্দিদের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার খর্বিত এবং তা ন্যায়বিচারের নীতির পরিপন্থী, কমিশনের এই বক্তব্য হাইকোর্টকে বিচারে দ্রুতি আনায় কোনও সক্রিয় হস্তক্ষেপে প্রণোদিত করতে পারেনি এখনও। অথচ হাইকোর্টের বিচারপতিরাই ১৯৮০-৯০-এর দশকে একের পর এক মামলায় বিচার-বিভাগীয় সক্রিয়তার মাধ্যমে কারান্তরালের বহু মর্মান্তিক কাহিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন, বন্দিদের অধিকারের সীমা সম্প্রসারণ এবং তার দৈনন্দিন প্রয়োগে নজরদারির ব্যবস্থা করেছেন। বাম জমানার ধারাবাহিকতায় তৃণমূল সরকারও বন্দিদের আন্দোলনকে দমন করেছে। পুলিশি তদন্তে ঢিলেমি, সরকারি উকিলদের গয়ংগচ্ছ মনোভাব, সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে বিচারে বিলম্বের ঐতিহ্য এতটুকু বদলায় নি। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে জেলেই মারা যান অসুস্থ ইউএপিএ বন্দী *পিপলস মার্চ* পত্রিকার সম্পাদক স্বপন দাশগুপ্ত।

ঘোর প্রত্যাশা জাগিয়ে পরিবর্তন এলেও শাসকীয় ক্ষমতার রাজনীতি বদলায় নি। মমতা সরকার রিভিউ কমিটির সুপারিশ মেনে দণ্ডিত বৃদ্ধদের অনেককে ছাড়লেও সত্তরোর্ধ ও গুরুতর অসুস্থ মাওবাদী মুখমাত্র গৌর চক্রবর্তী বা পতিতপাবন হালদারের মতো বৃদ্ধ মাওবাদী নেতারা মানবিক ছাড়ের যোগ্য বলে বিবেচিত হননি। এসইউসিআই নেতা প্রবোধ পুরকায়স্থের মতো অপরাপর প্রবীণ বন্দীও তালিকায় ঠাঁই পাননি। উল্টে বেড়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। রাজ্য সরকার মেদিনীপুর জেলে বন্দী ছত্রধর মাহাতো, সুখশান্তি বাস্কে, সুদীপ চোংদার, প্রসূন চ্যাটার্জি, রাজা সরখেল, ধৃতিরঞ্জন মাহাতো, প্রশান্ত পাত্র, কল্পনা মাইতি প্রমুখকে (অধিকাংশই রাজবন্দি হিসাবে আদালতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত) রাজ্যের বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত করেছেন। কারা-কর্তাদের আড়ালের দাবি, এরা নাকি জেল ভেঙ্গে পালানোর ছক কষছিলেন। তবে প্রকাশ্যে একে 'রুটিনমাফিক ট্রান্সফার' বলে দাবি করেছেন কারা বিভাগের আইজি। ওই রাজবন্দিদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইনেও মামলা চলছে। অধিকাংশই অন্যান্য মামলায় আদালত জামিন বা খালাস পেয়েছেন। প্রায় পাঁচ বছর জেলে বিচারাধীন থাকার পর 'কেস কানেকশন'-এর নাগপাশ যখন অনেকটা খুলেছে, তখন হঠাৎ এরা জেল পালাতে যাবেন কেন? বন্দীমুক্তি কমিটি, এপিডিআর এবং কমিটি ফর দি রিলিজ অফ পলিটিক্যাল প্রিজনারস এই বন্দিদের পরিবার-বন্ধু থেকে দূরে রেখে জেল-বদলির নেপথ্যে সরকারি দলের প্রতিহিংসাকেই দায়ী করেছে। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার বাসিন্দা ছত্রধর ও সুখশান্তিকে পাঠানো হয়েছে যথাক্রমে আলিপুর ও বাঁকুড়া জেলে, কলকাতার ছেলে প্রসূন ও রাজাকে যথাক্রমে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায়।

এর সঙ্গে চলেছে জেলের ভিতরে বা কোর্টে পুলিশের লক-আপে উস্কানিতে অপরাপর বন্দিদের হাতে রাজবন্দিদের হেনস্থা, দমনপীড়ন। অভিষেক মুখার্জি, সুনীল মন্ডল এবং সুভাষ রায় প্রেসিডেন্সি জেলের এই তিন রাজনৈতিক বন্দীকে শিয়ালদা কোর্টে কিছু সাধারণ বন্দি প্রবল মারধোর করে রক্ষী পুলিশের প্ররোচনায়। স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানিয়েও কোনও তদন্তের প্রতিশ্রুতি বা এধরনের নিগ্রহ বন্ধের কোনও আশ্বাস পায়নি এপিডিআর। সাত বছর জেলে কাটানোর পর এবং চণ্ডী সরকার ও আরও কয়েকজন একটি মামলায় বেকসুর খালাস পেলেও বৃদ্ধ চণ্ডীবাবু মাওবাদীদের সংগঠিত করতে সক্রিয়, এহেন অভিযোগে তাঁকে ফের জেলে ঢোকানোর সরকারি তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। সব্যসাচী গোস্বামী ও জাকির হোসেন পাঁচ বছর পর আদালতের নির্দেশে মুক্তি পাওয়ায় ফের তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে একই অভিযোগে। আদালতে তাঁরা শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও করেছেন।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলার জেলে বিচারাধীন ও দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দির সংখ্যা কত, কারা দফতরের ওয়েবসাইটে সে তথ্য মেলেনি। আগেই বলেছি, রাজনৈতিক বন্দির অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় না সরকারি সাইট বা অন্যত্র। মানবাধিকার সংগঠনগুলিও ধারাবাহিকভাবে এহেন বন্দিদের তালিকা রাখে না। এ বছরের গোড়ায় প্রকাশিত 'বন্দীমুক্তি কমিটি'র অসম্পূর্ণ তালিকা অনুযায়ী স্বীকৃত ও অস্বীকৃত মিলিয়ে রাজবন্দি ১৮০জন। এরমধ্যে ১১৮ জন মাওবাদী ও জনসাধারণের কমিটির সদস্য-সমর্থক। এসইউসিআই সদস্য-সমর্থক ৪৬ জন। (সারণি দ্রষ্টব্য) এর সঙ্গে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গ্রেফতারগুলিকে যোগ করলে মোট বন্দির সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। দার্জিলিং-এ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতৃত্বকে উদ্ধৃত করে বন্দীমুক্তি কমিটির হিসেব, অন্তত ২২০০ জন গজমুমু সমর্থককে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার করা হয়। এদের অনেকে ছাড়া পাবেন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন মোকাবিলায় পুলিশ-আদালত-জেলের ব্যবহারের শাসকীয় রাজনীতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় তৎপর একদা রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার অধুনা 'রাফ অ্যান্ড টাফ' মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে রিভিউ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের দাবি তুলেছেন এপিডিআর, বন্দিমুক্তি কমিটি, মাসুম, সিপিডিআরএস, সিআরটিপি, মানবাধিকার সংহতি, সিআরএস প্রমুখ সংগঠন। একই দাবি করেছেন কমিটির প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত ও সদস্য সুজাত ভদ্র। সরকার কানে তোলেনি। সরকার

না করলে বেসরকারি সদস্যরা কি তা প্রকাশ করে দেবেন? উত্তরটা জরুরি।

গণতন্ত্রের বন্ধুরা

মমতার এই ভোলবদলকে কী চোখে দেখছেন সরকার-ঘনিষ্ঠ এবং অধুনা সমালোচনামূলক সমর্থনের প্রবক্তারা? 'ফ্রেণ্ডস অফ ডেমোক্রাসি' সংগঠনের 'পরিবর্তন : ফিরে দেখা' শীর্ষক পুস্তিকা থেকে তার হদিশ মিলবে। তৃণমূল সরকারের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জুলাইতে প্রকাশিত পুস্তিকাটির যুগ্ম সম্পাদক সুজাত ভদ্র ও অশোকেন্দু সেনগুপ্ত। সুজাতবাবু বন্দিমুক্তি সংক্রান্ত রিভিউ কমিটি ও মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তি-উদ্যোগ সম্পর্কিত কমিটির সদস্য ছিলেন। অশোকেন্দুবাবু দ্বিতীয় কমিটিতে যুক্ত ছিলেন। গণতন্ত্রের বন্ধুদের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির সালতামামির সবটা এই প্রবন্ধের পরিসরে ধরা সম্ভব নয়। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আমি সীমাবদ্ধ থাকব মূলত এরাজ্যের মানবাধিকার আন্দোলনের উজ্জ্বলতম মুখ সুজাতবাবুর বক্তব্যে। তার আগে পুস্তিকাটিতে মানবাধিকার ও বন্দিমুক্তি প্রশ্নে এফওডি সংগঠনের সামগ্রিক মূল্যায়নটি তুলে ধরছি। 'আমাদের বিবেচনায় থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়—প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও মন্তব্য' শীর্ষক তালিকাটি কার্যত একনজরে সরকারের মার্কশিট বা রিপোর্ট কার্ড। প্রাসঙ্গিক অংশটি নিচে দেখুন—

সুজাতবাবু গোড়াতেই তাঁর সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন তাঁর বক্তব্যে। ''সিপিএম তথা বামফ্রন্ট যাতে অষ্টমবারের মতো সরকার গঠন না করতে পারে'' এই লক্ষ্যে ''নো টু সিপিএম'' ডাক দিয়ে ''স্থিতাবস্থার ব্যাধি'' থেকে মুক্তির পক্ষে 'দ্বিধাহীন, দ্ব্যর্থহীন' ভাবে 'সক্রিয়তা' দেখায় এফওডি। অন্যদিকে তাঁদের বিরোধী মানবাধিকার কর্মীরা ''মেকি বামপন্থীদের প্রস্থানকে জরুরি ও প্রাসঙ্গিক'' বলে ঘোষণা করলেও বা ''নৈতিক অবস্থান'' নিলেও রাজনৈতিক ''সক্রিয়তা' 'দেখাননি। তিনি লিখেছেন, ''হয়তো তারা মনে মনে একটি আশা পোষণ করেছিলেন, কম মার্জিনে হলেও বামফ্রন্ট সরকারই অধিষ্ঠিত হবে এবং যথারীতি ক্ষমতাসীন মেকি বামপন্থীদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন চলবে; পূর্বের মতো এক কক্ষপথে ঘুরপাক খাবে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ তাদের গুপ্তসুপ্ত বাসনা পূরণ করলেন না; বিপুলভাবে সিপিএমকে পর্যদুস্ত করলেন, ক্ষমতা থেকে সরালেন। ব্যস, রাগ-ক্রোধ এসে পড়ল অপাত্রের উপর।'' শুধু তাই নয়, ''এফওডি যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুকের সাথে এও লক্ষ্য করেছে যে ''রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সক্রিয়তা যাঁরা দেখালেন না, তারাই নতুন সরকারের প্রথম দিন থেকে, এমনকি আগে থেকেই নানা জাতীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-কটাক্ষ-সমালোচনা শুরু করেছিলেন, তাঁরাই হঠাৎ কয়েকমাস পর থেকেই বলতে শুরু করলেন, তারা সরকারের দ্বারা 'প্রতারিত' বোধ করছেন, ভান করলেন তাঁরা যেন বিপুল তথা আমূল পরিবর্তনের জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন নাকি এই পটপরিবর্তন বাংলাকে 'সোনায় মুড়ে' দেবে।'' এর বিপরীতে এফওডি তথা গণতন্ত্রের বন্ধুরা ''চেষ্টা করে আসছে উচ্ছ্বাস, আবেগ বা কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি বিবর্জিতভাবে নতুন সরকারের কার্যকলাপকে পর্যালোচনা করতে; যখনই মনে হয়েছে গণতন্ত্র আক্রান্ত হয়েছে, যখনই মনে হয়েছে সরকারি সিদ্ধান্ত জনবিরোধী, তখনই এফওডি সাধ্যমতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানিয়েছে।''

সুজাতবাবুর বক্তব্যের নির্যাস এটাই— সিপিএম বিতাড়নে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকার জোরে তৃণমূল সরকারের অন্যায়, ভুলত্রুটির সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার তাঁদেরই। তাঁদের সমালোচকরা সকলেই ছদ্ম সিপিএম-বিরোধী। পরিবর্তনকালে রাজনৈতিক শিবির বেছে নিতে অপারগ-অস্বীকৃতরা সে অধিকার কার্যত হারিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এফওডি-র সিপিএম-বিরোধিতা রাজনৈতিক হলেও এখন বর্তমান সরকারের প্রতি তাঁদের সমালোচনা ''রাজনৈতিক অভিসন্ধি বিবর্জিত'' তথা বিদ্বেষরহিত এবং মাত্রাজ্ঞান সম্পন্ন। অনেকে সুজাতবাবুর বক্তব্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'আমরা-ওরা' (বুশ-তত্ত্বের ধরতাইও আসতে পারে) তত্ত্বের প্রতিধ্বনি শুনতে পারেন। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ থেকে বাঁচিয়ে মানবাধিকার আন্দোলনের আদর্শ-লক্ষ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রবক্তার ক্ষমতা দখলের আবিলতায় যুক্ত বিশেষ রাজনৈতিক নেত্রী ও তাঁর সরকারের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনে তন্নিষ্ঠতায় কর্তিত-লাঙ্গুল

প্রত্যাশা	প্রাপ্তি	মন্তব্য
৩। মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কিত প্রচলিত অধিকার ও আইন প্রয়োগের নিশ্চয়তা। দানবীয় নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগে পূর্ণ বিরতি।	হয়নি	হতাশাজনক; নির্বাচনী প্রতিশ্রুত পালিত হয়নি।
৪। জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করে আলোচনার উপযোগী গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনা এবং সর্বত্র রাজনৈতিক হিংসা ও সংঘর্ষ রোধে পরিকল্পনা রচনা। রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তিদান।	হয়নি	হতাশাজনক/ব্যতিক্রম NCTC

নীলকান্ত শৃগালের গল্পও মনে করাতে পারে। কিন্তু আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই বন্ধু-সমালোচকের সরকার-মূল্যায়নেই নজর দেব।

সুজাতবাবুর প্রবন্ধ 'পরিবর্তনের বছরগুলিতে মানবাধিকারের হালহকিকৎ' বিশদে বর্ণিত। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-নেতাই-এর পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে গণতন্ত্রের বন্ধুরা ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন বিরোধী নেত্রীর বিবেচনার জন্য একটি দাবি সনদ পেশ করেন। ভদ্রের কথায়, ''স্বীকার্য, তৃণমূল কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে কিছু কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিল। আবারও এটাও স্বীকার্য, রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্তে মুক্তির প্রশ্নে অথবা যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের প্রশ্নে স্পষ্ট, স্বচ্ছ কোনো অবস্থান জানায়নি।'' এরপর মমতার নির্বাচনী ইস্তেহার উদ্ধৃত করে তিনি প্রতিশ্রুতিটি উল্লেখ করেছেন— ''রাজনৈতিক বন্দিদের ক্ষেত্রে রিভিউ কমিটি গঠন করে দেখা হবে তাঁরা শাস্তি পাওয়ার মতো অপরাধ করেছেন, নাকি প্রতিহিংসাপরায়ণতার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে। কমিটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'' এছাড়াও 'বিনা বিচারে রাজনৈতিক বন্দীদের দ্রুত মুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা', 'অ-রাজনৈতিক' বিচারাধীন কয়েদির ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ', 'গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও মানবাধিকারকে যথাযথ গুরুত্ব ও প্রাধান্য' ইত্যাদি প্রশ্নে তৃণমূলের ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতির কথাও সুজাতবাবু উল্লেখ করেছেন।

ভোটের পর মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্তে রিভিউ কমিটি গঠনের উল্লেখ করে তিনি মনে করাতে ভোলেননি— ''গণআন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও তিক্ত বিতর্ক শুরু হয় দুটি শর্ত নিয়ে এবং কমিটির বিন্যাস নিয়ে।'' এরপর 'চূড়ান্ত বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে কাজ করেও' কমিটি ডিসেম্বর ২০১১ এবং অগস্ট ২০১২ সালে সরকারের কাছে সুপারিশসহ দুটি রিপোর্ট পেশ করে। সরকারের কাছে, রিভিউ কমিটি 'শর্তবিহীনভাবে' বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তির সুপারিশ করেছে। একইসঙ্গে ৩-১৪ বছর পর্যন্ত বিচারাধীন 'অ-রাজনৈতিক বন্দি'দেরও মুক্তির সুপারিশ রয়েছে। **এরপর ভদ্রের মন্তব্য— ''দুঃখজনক হলেও সত্যি, সরকার সুপারিশের সামান্য অংশ কার্যকর করেছে।''** এই প্রসঙ্গে তিনি নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের ফৌজদারি মামলাগুলি এবং জাঙ্গিপাড়ার ৫০টির মতো মামলা প্রত্যাহারের সরকারি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন। এর সঙ্গে রয়েছে উত্তরবঙ্গের ৫০ জন রাজনৈতিক বন্দিমুক্তির সিদ্ধান্ত এবং নন্দীগ্রামের তিনজন 'মাওবাদী'র বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার কথা। কিন্তু তিনি এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন— ''লালগড়ে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত ছত্রধর মাহাতো সহ অসংখ্য ব্যক্তি গাদা গাদা মামলায় বন্দি হয়ে আছেন। সরকার কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। ইউএপিএ-র মতো কালাকানুনে পূর্বতন সরকারের আমলে ১০০ জন ধৃত। বহুজন আজও বন্দি; এই নতুন সরকারও কয়েকজনকে ইউএপিএ-তে বন্দি করে রেখেছে। এছাড়া, নিয়মিত ব্যবধানে জঙ্গলমহল থেকে 'মাওবাদী' সন্দেহে গ্রামবাসীদের গ্রেফতারি নীতি পূর্বতন সরকারের মতই চলছে।''

এহেন পর্যবেক্ষণের পর তাঁর সমালোচনা— ''এই সার্বিক প্রেক্ষাপটে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক অধিকার ও পরিবেশ রক্ষা ও সম্প্রসারণের প্রশ্নে ব্যর্থ শুধু নয়, নানা সময়ে সঙ্কোচনের চেষ্টাও করেছে। যৌথবাহিনী প্রত্যাহার না হলে জঙ্গলমহলে প্রকৃত শান্তি ফিরবে না। ছত্রধরদের নিঃশর্তে মুক্তি না দিলে জঙ্গলমহলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রশমিত হবে না। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবি একটি গণতান্ত্রিক দাবি। সরকারের সেই দাবি মানা উচিত।'' সরকার যে বৃহত্তর গণতন্ত্রের প্রশ্নে মিত্রস্থানীয়, বন্ধুভাবাপন্ন নাগরিক সমাজের কথাও কানে তুলছেন না, সে আক্ষেপও সুজাতবাবু ও তার সহগামী গণতন্ত্রের বন্ধুদের মূল্যায়নে স্পষ্ট। সরকারের কাছে তাদের অপ্রাপ্তির তালিকা বেশ লম্বা। সুজাতবাবুর নিজের উল্লেখ্য ঘটনা বা ইস্যুগুলির মধ্যে রয়েছে— নন্দীগ্রামে অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে মামলা করায় সিবিআই-কে অনুমতি প্রশ্নে টালবাহানা, ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা রোধে সরকারি তৎপরতার অভাব, ধর্ষিতা মহিলার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ, 'প্রশ্ন করলেই গ্রেফতার, হাজতবাস বা ন্যূনতম পক্ষে চরম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ', কামদুনি ও অন্যান্য ধর্ষণ-হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিন্দনীয় ব্যবহার, দুবছরের মধ্যে ছয় দফা পুলিশি গুলিচালনা ও মৃত্যু, ধনেখালিতে পুলিশ হেফাজতে তৃণমূল কর্মী নাসিরুদ্দিনকে পিটিয়ে হত্যা ও এসএফআই কর্মী সুদীপ্ত গুপ্তের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় দায়সারা বিবৃতি, মানবাধিকার সংগঠন সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের সভা-সমিতি-মিছিলে কার্যত নিষেধাজ্ঞা, ধর্মতলায় শাসক দলের সভার মৌরসিপাট্টা, বালির পরিবেশকর্মী তপন দত্ত ও সুঁটিয়ার গুণ্ডারাজ-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক বরুণ বিশ্বাসের হত্যার তদন্তে ঢিলেমি, সরকারি গ্রন্থাগারের তালিকা থেকে অপছন্দের পত্রপত্রিকা ছাঁটাই, ধর্মঘট বা বন্‌ধ সমর্থকদের আর্থিক ও অন্যান্য শাস্তি ইত্যাদি।

ফেল করা ছাত্রীর ভালো গ্রেড

উপরোক্ত বিষয়গুলিতে 'পূর্বতন সরকারের ধারাবাহিকতাকেই বহন' করার কারণে সুজাতবাবুর মূল্যায়ন— **''নতুন সরকারকে পাস মার্ক দেওয়া যাচ্ছে না, ফেল করাতেই হচ্ছে।''** **কিন্তু এটাই তাঁর সম্পূর্ণ মূল্যায়ন নয়। তিনি 'পরিবর্তনের সরকারকে ভালো গ্রেড-সহ পাশ-মার্ক'** দিয়েছেন মূলত সরকারের অর্থনৈতিক নীতিগুলির জন্য। এই তালিকায় রয়েছে— বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণ না করার নীতি বারবার ঘোষণা, নয়াচরে কেমিক্যাল হাব বাতিল, রাজ্য সেজ আইন বাতিল, হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ

কেন্দ্র বাতিল, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ বিরোধিতা, জিন পরিবর্তিত সোনালি ধান চাষে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা, সিঙ্গুরে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরানোর আইনি উদ্যোগ, পূর্ব কলকাতায় জলাভূমি দখল আটকানোর আইনি প্রচেষ্টা এবং একাধিক গণহত্যা কাণ্ডের তদন্তে কমিশন গঠন ও জেলাভিত্তিক মানবাধিকার আদালত গঠন। এইসব প্রশ্নে নতুন সরকারের 'সদর্থক অবস্থান'-এর কারণে 'সরকারকে ভালো নম্বর' দেওয়ার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে সুজাতবাবু প্রয়াত *অনীক* সম্পাদক তথা 'পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার আন্দোলনের অতি পরিচিত নাম, তথা অ-দলভুক্ত বাম বুদ্ধিজীবী বলে সম্মানিত, সদ্য প্রয়াত দীপংকর চক্রবর্তী'-র বক্তব্য টেনেছেন সুজাতবাবুর বয়ানে। (যেটা তিনি উল্লেখ করেননি তা হল দীপংকরবাবু এপিডিআর-এর অভ্যন্তরীণ বিতর্কে তাঁর অন্যতম প্রতিপক্ষ ছিলেন।) যার মোদ্দা কথা হল, 'মানবাধিকার প্রশ্নে সরকারের সদর্থক পদক্ষেপকে দ্বিধাহীন অভিনন্দন' এবং 'মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী পদক্ষেপের নিন্দা এবং বিরোধিতায় অবিচল আন্দোলন। এই অবস্থানের আপাতগ্রাহ্যতা (কেননা সরকারি নানা নীতি ভিতরে-বাইরে নানা স্বার্থ, লবির চাপে-তাপের ফসল যা অনেকক্ষেত্রে খণ্ডিত, পরস্পরবিরোধী ও বিভ্রম সৃষ্টিকারী। কিন্তু শেষপর্যন্ত একটি সামগ্রিক পূর্বাপরতা বা ধারাবাহিকতা রাজনীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ভূমিকা পর্যবেক্ষকরা খুঁজে থাকেন) মেনে নিয়েও কয়েকটি বিনীত প্রশ্ন রাখছি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি ও খুচরো ব্যবসা ইত্যাদি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক নীতি নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সমর্থক নাগরিক সমাজের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মোটের উপর সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু 'ভালো' অর্থনৈতিক নীতি-দর্শন কী 'খারাপ' রাজনৈতিক বা মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতি-দর্শনের বিকল্প হতে পারে? মমতার কৃষক, কৃষি এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের প্রতি মমত্ব কতটা নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির উন্নয়নী মডেলের বিরোধিতা-প্রসূত, কতটা বা ভোটের রাজনীতির অঙ্ক-নির্ধারিত সে বিতর্ক গণ-রাজনীতির পরিসরে এই মুহূর্তে প্রধান বিচার্য নয়। কর্পোরেট হৃদয়-সম্রাট ও আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের প্রবক্তা নরেন্দ্র মোদী তথা সঙ্ঘ পরিবার বনাম বাজার-বিপ্লবীদের এতকালের আস্থাভাজন কংগ্রেসি পরিবারতন্ত্রের আম-আদমি প্রেমের দ্বৈরথপর্বে আঞ্চলিক শাসকদের অবস্থানের ভিন্নতা জল-জঙ্গল-জমিন বাঁচানোর আন্দোলনগুলির পক্ষে কিছুটা স্বস্তিদায়ক হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারকে নিকেশ করে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধির গল্প যে সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক তা তো বিশ্বের ইতিহাসে বারংবার প্রমাণিত। অন্যদিকে রয়েছে বহু-চর্চিত দলতন্ত্র কায়েমে সিপিএম-এর স্থূল অনুকরণ এবং বিরোধ-সমালোচনার ন্যূনতম সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিসরটুকু গিলে ফেলার উৎকট প্রচেষ্টা। এবং সিপিএম-এর দলতন্ত্র থেকে একধাপ এগিয়ে একনায়কতান্ত্রিক ব্যক্তিপূজার ফ্যাসিবাদী-প্রবণতা। সম্প্রতি কেন্দ্রের অনুকরণে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে প্রাক্তন ডিজি-কে সদস্য করে সরকারের সমালোচনামূলক সুপারিশগুলো আটকানোর পথে হেঁটেছেন মমতা। এহেন উদাহরণ দ্রুত বাড়ছে। এরপরও 'ভালো গ্রেডসহ পাস-মার্ক' কি পরীক্ষকের প্রলম্বিত বিভ্রম, না সচেতন ভাবের ঘরে চুরি? বিশেষ করে পরীক্ষক যখন মানবাধিকার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়, তখন তাঁর 'সাবজেক্টে' ডাহা ফেল-মারা ছাত্রীকে অপরাপর বিষয়ে 'ভালো গ্রেড' প্রদান সমালোচনা ও প্রশংসার ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা বলে প্রতিভাত হতে পারে।

যে প্রশ্নগুলি আজও উত্তর খোঁজে

নতুন সরকারের অভিষেকের অব্যবহিত আগে ও পরে রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি, রিভিউ কমিটি গঠন, তার বিচার্য বিষয়গুলি তথা সরকারি 'টার্মস অব রেফারেন্স' নিয়ে রাজ্যের মানবাধিকার আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ তিক্ত বিতর্ক অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে পর্যবসিত হয়। তার রেশ এখনও রয়েছে। যে নীতিগত প্রশ্নগুলিতে আলো পড়লে বা মীমাংসা হলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী-সমর্থকরা উপকৃত হতেন তা হলো— সরকার, শাসক ও বিরোধী দল বা দুপক্ষের বৃহত্তর শিবিরের সঙ্গে মানবাধিকার আন্দোলন-সংগঠন তথা নাগরিক সমাজ এবং সরকার ও দলনিরপেক্ষ গণ-রাজনৈতিক পরিসরের ভেদরেখা রক্ষা কতটা জরুরি এবং কীভাবে তা সম্ভব? নাকি এমন পরিসরের ভাবনা আকাশকুসুম মাত্র, শিবিরভুক্তিই সক্রিয়তার একমাত্র পথ? স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় যে জনপ্রিয় সরকার ও নয়া শাসকদলের উত্থান, তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষায় বিপুল জনতার জড়িয়ে থাকা অনস্বীকার্য। কিন্তু ভুয়োদর্শী, ইতিহাসপ্রাজ্ঞ নয়া জমানার প্রধান কুশীলবদের রাজনৈতিক-সামাজিক উৎস ও এতাবৎকালের ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপসহীনতায় বিশ্বাসীদের ভূমিকা কী হবে? লঙ্কায় যে যায়, সেই হয় রাবণ— লোক অভিজ্ঞতার এই কালজয়ী নির্যাস তো তাঁরা ইতিহাসচর্চা এবং সমাজ-অনুশীলনে গভীরভাবে জানেন। না, রাম না জন্মাতেই রামায়ণ' লেখার কথা বলছি না। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে হোক বা সমাজতন্ত্রের নানা ফলিত অভিজ্ঞতায় ক্ষমতালাভের পর বিরোধী-পর্বের গণতন্ত্র-কাতরতা, তাবৎ নিপীড়িতের সাথে আত্মীয়তার অঙ্গীকার ভুলে শাসকধর্মের জয়গাথা এবং একদা বন্ধুদের উপর হিংস্র আক্রমণ কি নতুন ঘটনা? এরপরও দলভুক্ত কপিত্থের ন্যায় আচরণ বা স্রোতে ভেসে যাওয়া অনিবার্য? এভাবেই কি মাটির কাছাকাছিথাকা যায়? পুরনো স্বৈরাচারীদের প্রত্যাবর্তনের পথ আটকাতে নবোদ্ভিন্ন স্বৈরাচারের কুললক্ষণ ভুলে দুরাশা-আশঙ্কার দোলাচলে দোলাই কি তবে নাগরিক সমাজ তথা গণতন্ত্রের বন্ধুদের ভবিতব্য?

প্রশ্নগুলি নতুন নয়। ৩৭ বছর আগে ইন্দিরা স্বৈরাচারের বিরোধিতায় পুনরুজ্জীবিত নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অন্যতম ফসল পিইউসিএল ভাঙ্গে জরুরি অবস্থা পরবর্তী 'বন্ধু' জনতা সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে। সেদিনের বন্ধুরা তখন অনেকেই মন্ত্রী। গণতন্ত্রের যুদ্ধে জয়ী সরকারের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ক্ষমাসুন্দর বা ঢোঁক-গেলা সমালোচনার যারা বিরোধী, তাদের বিপক্ষে উঠেছিল ইন্দিরা-শাহী ফেরার পথ সুগম করার অভিযোগ। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে আমরা ভঙ্গবঙ্গে তার পুনরাবৃত্তি দেখেছি। তৃণমূল সরকারের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে যে বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হয় রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির ইস্যুতে। এতকালের সহযোগীরা পরস্পরকে বিদ্ধ করলেন তৃণমূলের কাছে আত্মবিক্রয় বা সিপিএম-এর সঙ্গে গোপন আতাতের অভিযোগ। ক্ষতিগ্রস্থ হল আন্দোলনের ঐক্য ও কর্মীদের মনোবল এবং বিভ্রান্ত হলেন সমর্থক-শুভার্থীরা। গণমাধ্যমে তা চাউর হতে সময় লাগেনি। ''বন্দিমুক্তি আন্দোলনের উজ্জ্বল ঐতিহ্য এক চরম নিন্দাযোগ্য বিভ্রান্তি ও সংশয়ের মুখোমুখে দাঁড়িয়ে অনেকটাই ম্লান হয়ে গেল।''— এপিডিআর মুখপত্রে 'অধিকার'-এ এবছর জানুয়ারি মাসে একথা লিখেছেন প্রয়াত দীপংকর চক্রবর্তী। সম্ভবত মৃত্যুর আগে এটাই তাঁর শেষ লেখা। দুপক্ষের প্রধান কুশীলবদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতটাই বিষিয়ে উঠল যে কিষেনজি হত্যায় সুজাতবাবুদের ভূমিকার অভিযোগ উঠল। কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই এহেন প্রকাশ্য কালিমালেপন এর আগে দেশের মানবাধিকার আন্দোলনে ঘটেনি। আজাদ হত্যার পর স্বামী অগ্নিবেশকে কেন্দ্র করেও এহেন গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই মাওবাদী নেতৃত্বও এমন অভিযোগ করেননি। তবু কাদা ছোঁড়াছুড়ি চলল। অবশ্যই এ দায় কোনও একপক্ষের নয়। কিন্তু দায় বিচারের শব ব্যবচ্ছেদ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। মানবাধিকার আন্দোলনে দীর্ঘকালীন নীতিগত বিতর্কগুলির একাংশ পরিস্থিতির প্ররোচনায় কীভাবে বারংবার উঠে আসে তার অমীমাংসিত চাপা পড়া ক্লেদ ও গরল নিয়ে, সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণই এ প্রসঙ্গ অবতারণার উদ্দেশ্য।

সমস্যাটা শুধু নির্বাচিত সরকারগুলির সঙ্গে গণসংগঠন-আন্দোলনের সম্পর্ক, আলাপ-আলোচনা, দর-কষাকষি ঘিরে নয়। অন্ধ্রে এপিসিএলসি ভেঙেছে কে বালাগোপালের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পাশাপাশি অ-রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বিশেষত মাওবাদী হিংসার সমালোচকদের সঙ্গে মাওবাদী সমর্থকদের তীব্র মতবিরোধের জেরে। শুধু অন্ধ্র নয়, কাশ্মীর থেকে মণিপুর, ছত্তিশগড় থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় হিংসার পাশাপাশি তার সশস্ত্র প্রতিস্পর্ধী দল ও গোষ্ঠীগুলির হিংসা, বিশেষত অসামরিক আমজনতার জীবনে নিদারুণ বাস্তবতা। দুই হিংসার প্রতিযোগিতার বিভীষিকার এক তুল্যমূল্য দায় নিয়ে গোটা দেশের মানবাধিকার আন্দোলনে বিভাজন ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের 'সন্ত্রাসবাদী' ধারাকে ঘিরে এই বিতর্ক প্রথম দানা বাঁধলেও আমাদের ঔপনিবেশিক কালে উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বের মতো রাষ্ট্রশক্তি এবং সশস্ত্র বিদ্রোহী-বিপ্লবীদের দীর্ঘকালীন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে তত্ত্বের আসর ছেড়ে বিতর্কগুলির অভিঘাত এখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নেমে এসেছে। মাওবাদী দল সহ অপরাপর সশস্ত্র বিদ্রোহী-বিপ্লবীদের দ্বারা মানবাধিকার হনন, যুদ্ধাপরাধ এবং গণতন্ত্র হরণের ঘটনা ও প্রবণতা সম্পর্কে নীরবতা বা দায়সারা নিন্দা জঙ্গলমহলে ও অন্যত্র রাজবন্দিদের মুক্তির দাবির নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করেছে।

এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে জনমত গঠন করতে হলে রাষ্ট্রীয় হিংসা-সন্ত্রাসের সমর্থনবাচক প্রতর্কগুলির যথাযোগ্য জবাব দিতে হবে। স্ববিরোধিতা বা এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই। জিহাদি সন্ত্রাস এবং অপরাপর অরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে কখনও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অনিবার্য প্রত্যুত্তর বা কখনও তা মানবাধিকার এবং বন্দিমুক্তি আন্দোলনের বিষয় নয় বলে এড়িয়ে গিয়ে অভ্যন্তরীণ বিতর্কগুলিকে ঠাণ্ডাঘরে পাঠানোর দিন ফুরিয়েছে। নিঃসন্দেহে এসব বিষয়ে বিতর্ক-বিশ্লেষণ ও অবস্থান গ্রহণ প্রবাদোক্ত পান্ডোরার বাক্স খোলা বা মাইনবিছানো যুদ্ধক্ষেত্রে হাঁটার সামিল। কিন্তু সে ঝুঁকি না নিলে মানবাধিকার ও বন্দীমুক্তি আন্দোলন কখনই জনমনে গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বজনীনতা অর্জন করবে না। সরকার-মুখাপেক্ষিতা এবং মতাদর্শগত অন্ধতার কানাগলি পেরিয়ে এই বিপদসঙ্কুল পথে আমাদের অন্যতম আলোকবর্তিতা হতে পারে বিগত দশকে অন্ধ্রের কমিটি অব কনসার্নড সিটিজেনস-এর দীর্ঘস্থায়ী, ধৈর্য্য ও ধীসম্পন্ন উদ্যোগ। সিসিসি-র এই উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে অন্ধ্র সরকার ও মাওবাদীদের শান্তি-আলোচনা নানা কারণে ভেস্তে গেলেও মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ, তথা আদিবাসী-মূলবাসী প্রান্তজনের সহমর্মী নাগরিক সমাজের নিরপেক্ষ উদ্যোগ সমাজের সর্বস্তরে আজও প্রশংসিত। সর্বভারতীয় ও রাজ্যস্তরে এহেন উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা আজ অনেকেই অনুভব করছেন। এবং তা শুধু সরকার ও তার সশস্ত্র প্রতিস্পর্ধীদের মধ্যে শান্তি আলোচনার পটভূমি রচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। যুদ্ধ ও শান্তি-পর্বের লাভ-ক্ষতি হিসেবের বাইরে মানবাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে মনে রেখে সবপক্ষের পার্টিজানরা তাঁদের মানবিকতাবোধকে দ্বিচারিতামুক্ত করলে এবং আমজনতার প্রতি দায়বদ্ধতাকেই প্রাধান্য দিলে রাজবন্দিদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের নৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তি প্রসারিত হবে ও তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

পরিশিষ্ট

একনজরে পশ্চিমবঙ্গে বিচারাধীন বন্দীদের মামলাগুলি পর্যালোচনার জন্য রাজ্যস্তরীয় কমিটির গঠন

কমিটি গঠনের সরকারি বিজ্ঞপ্তি

৪ জুন ২০১১ (দ্য ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রা-অর্ডিনারি)। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত শাখার 'প্রস্তাব' তৎকালীন মুখ্যসচিব সময় ঘোষ স্বাক্ষরিত মন্ত্রীসভার ক্যাবিনেট বৈঠকে ১০ মে, ২০১১ তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্তটি রাজ্যপালের অনুমোদিত ও তাঁর বকলমে প্রচারিত।

সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপট

'রাজ্যপালকে এই ধারণা দেওয়া হয়েছে'— কিছু বিচারাধীন বন্দি বিচারপর্ব সম্পূর্ণ না হওয়ায় দীর্ঘকাল আটক রয়েছেন। তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মামলাগুলি পর্যালোচনা প্রয়োজন। রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত থাকার সুবাদে কোনও অপরাধের কারণে সাজাপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রেও এই পর্যালোচনা দরকার। এছাড়াও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সাজানো এফআইআর-এর ভিত্তিতে রুজু মামলাগুলিও খতিয়ে দেখা জরুরি।

সেকারণে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মলয় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়েছে। সদস্যদের ছয়জন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি আমলা ও শীর্ষস্থানীয় পুলিশ অফিসার প্রমুখ এবং বাকি ছয়জন 'মানবাধিকার/সামাজিক সংগঠন/আইনজীবী পেশার প্রতিনিধি'।

রিভিউ কমিটির বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ক) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এফআইআর চিহ্নিতকরণ;

খ) পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনাগার সংক্রান্ত কার্যবিধি আইনের (ওয়েস্ট বেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট, ১৯৯২) ২৪ নম্বর ধারার ভিত্তিতে রাজনৈতিক আন্দোলন সূত্রে কৃত অপরাধের কারণে অভিযুক্ত বিচারাধীন বন্দিদের চিহ্নিতকরণ;

গ) একই সূত্রে অপরাধের কারণে দণ্ডিতদের চিহ্নিতকরণ;

ঘ) ওইসব অপরাধের প্রেক্ষাপট, ধরন এবং চরিত্র চিহ্নিতকরণ;

ঙ) সংশোধনাগারে বন্দিদের আচার-আচরণ পরীক্ষা

চ) একই ধরনের অপরাধে ফের করার সম্ভাবনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য নির্ধারণ (to ascertain the probability of their reverting back to the commission of offences);

ছ) ওই ব্যক্তিদের দ্বারা অন্যদের একই ধরনের অপরাধ করায় উস্কানি দেওয়ার সম্ভাবনা পরীক্ষা (to examine the probablity of instigating others to commit the offences)

কমিটির কার্যবিবরণীর সংক্ষিপ্তসার

তিনমাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। এরপর দুদফায় ছয়মাস করে কমিটির মেয়াদ ২০১২-এর অগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়। কমিটির ১৫ মাসের কার্যসীমার মধ্যে ২০১১-এর ডিসেম্বরে অন্তর্বর্তী রিপোর্ট এবং ২০১২-এর আগস্টে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। কোনও রিপোর্টই সরকার এ পর্যন্ত জনসমক্ষে আনেনি। বেসরকারি সদস্যরাও তাঁদের বয়ান প্রকাশ করেননি। আরটিআই বা তথ্য জানার আইনের মাধ্যমে এপিডিআর সভাপতি অমিতদ্যুতি কুমার ২০১২ সালের জুনে কমিটির যে অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর সরকারি কার্যবিবরণী পেয়েছেন, তাতে চূড়ান্ত রিপোর্ট বা তার সুপারিশের সারাংশ নেই। এখানে তাঁর প্রাপ্ত কার্যবিবরণীর উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ দেওয়া হলঃ

১১ জুন ২০১১ তারিখে কমিটির প্রথম সভার সরকারি তরফে ৮৩ জন রাজনৈতিক বন্দির তালিকা পেশ করা হয়। এই বন্দীরা সকলেই রাজবন্দির স্বীকৃতি আদালত থেকে পেয়েছেন বলে জানানো হয়। সেই তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলে স্বীকৃত রাজবন্দির সংখ্যা : দমদম- ৩, জলপাইগুড়ি- ১৫, বহরমপুর- ১, কোচবিহার- ৪৩, কৃষ্ণনগর- ১১, মালদা- ১ এবং আলিপুরদুয়ার- ৯। বিভিন্ন আদালতে বা কারাবিভাগের আইজি-র কাছে রাজনৈতিক বন্দির স্বীকৃতি চেয়ে বিচারাধীন বন্দিদের আবেদন পড়ে আছে কি না তা কমিটি জানতে চায়। কমিটি এটাও ঠিক করে যে আগে বিচারাধীন এবং পরে দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মামলাগুলি পর্যালোচনা করবে। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়, বিচারে বিলম্ব বা অসম্পূর্ণতার কারণে দীর্ঘকাল জেলে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের 'অবিলম্বে জামিন পাওয়া উচিত'। সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলন সূত্রে রুজু মামলাগুলির বিশদ বিবরণ হুগলী ও পূর্ব মেদিনীপুরের জেলার এসপি-দের থেকে চেয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। ওই মামলাগুলিতে দায়রা আদালত, সেশন্স কোর্টে বিচার্য এবং ম্যাজিস্ট্রেট স্তরে বিচার্য হিসেবে ভাগ করতে বলা হয়।

সরকারিভাবে আরও জানানো হয়, পয়লা মার্চ ২০১১ পর্যন্ত এক বছরের বেশি বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা ২৮৯১। এক বছরের বেশি— ১৭১, দুবছরে বেশি— ১১৯৯, তিন বছরের বেশি— ৬৯৩, চারবছরের বেশি— ৩৫৩, পাঁচবছরের বেশি— ১৯০, ছয় বছরের বেশি— ১৩৩, সাতবছরের বেশি— ৭৭, আটবছরের বেশি— ২২, নয় বছরের বেশি— ৪১, দশবছরের বেশি— ১২।

কমিটি মনে করে, এভাবে বছরের পর বছর বিচারাধীন বন্দীদের আটকে রেখে তাঁদের সাংবিধানিক ও আইনি অধিকারের চূড়ান্ত অবমাননা করা হচ্ছে। এবং সরকারের কাছে এঁদের সকলকে জামিন দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা উচিত।

দ্বিতীয় বৈঠকে (২০ জুন, ২০১১) কমিটি ৮৩ জন আদালত-স্বীকৃত বন্দির জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে দুবছরের বেশি বিচারাধীন বা বিনা বিচারে আটক বন্দিদের ক্ষেত্রেও একই উদ্যোগের কথা বলে। ওইদিনই সরকারিভাবে ১৭ জুন ২০১১ পর্যন্ত আদালতে রাজনৈতিক বন্দির স্বীকৃতিকামী বন্দিদের আবেদনের তালিকা এবং দায়রা ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য মামলার তালিকা কমিটির কাছে পেশ করা হয়। এই তিনটি তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ও মামলার সংখ্যা অনুল্লিখিত।

তৃতীয় বৈঠকে (২৮ জুন, ২০১১) ৮৩ জন স্বীকৃত রাজবন্দির জামিনে মুক্তির ব্যাপারে সরকারের 'ডাইরেক্টর অব প্রসিকিউশন'কে উদ্যোগী হতে এবং পরবর্তী সভায় রিপোর্ট দিতে বলা হয়। তাছাড়া আইজি(কারা)-কে বলা হয় তিনি অন্যান্য রাজবন্দিদের ক্ষেত্রেও রাজ্য আইন মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন স্বীকৃতি দানে তাঁর ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারেন। একইসঙ্গে কমিটি রাজনৈতিক বন্দিদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা তুলে নেওয়ার সুপারিশ জানিয়ে সরকারের প্রসিকিউশন অধিকর্তাকে মামলাগুলি খতিয়ে দেখতে বলে। সিঙ্গুর আন্দোলন সূত্রে রুজু মামলাগুলির তালিকা পেশ হয়। রাজনৈতিক বন্দিদের আত্মীয়স্বজন, আইনজীবী প্রমুখের মাধ্যমে আবেদন সংগ্রহের জন্য সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত হয়। বিভিন্ন জেলে গিয়ে রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার জন্য একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। এ বিষয়ে 'জোর' দেওয়া হয় যে, সাবকমিটি আইজি(কারা)-র থেকে 'প্রয়োজনীয় অনুমতি' নেবে।

চতুর্থ বৈঠকে (১৮.৭.২০১১) সরকার জানায়, ৮৩ জন আদালত-স্বীকৃত রাজনৈতিক বন্দির তালিকাটিতে 'কিছু ভুল' রয়েছে। সংশোধিত তালিকাটি কমে দাঁড়াল ৭৮ জনের। যাঁরা আদালত থেকে জামিন পাননি এমন কয়েকজন বন্দি ছাড়া বাকি সকলকে 'কালবিলম্ব' না করে জামিনে মুক্তির জন্য সুপারিশ করে কমিটি। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার জন্যও সরকারকে ভাবতে বলে। সদস্যদের জেল-পরিদর্শনের পরিকল্পনা হয়। সিঙ্গুর আন্দোলনের সূত্রে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে বিচার্য সব মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়। সেসন কোর্টের মামলাগুলির ক্ষেত্রে একই সুপারিশের আগে তা খতিয়ে দেখতে একটি কোর কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত হয়।

পঞ্চম বৈঠকের (১৯.৮.২০১১) কার্যবিবরণীতে বলা হচ্ছে, কমিটির প্রথম বৈঠকে আইজি (কারা) রাজ্যের জেলগুলির যে বন্দি তালিকা পেশ করেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, ২৬৭ জন রাজনৈতিক বন্দি রয়েছেন। এবার কমিটি ২৬৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণী জানতে চায়। এছাড়া বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত রাজবন্দির মর্যাদা চেয়ে আবেদনগুলির একটি সুবিন্যস্ত তালিকাও পেশ করতে বলে। তিনমাসের মেয়াদ কাজের চাপের তুলনায় কম হওয়ায় তা আরও ছয়মাস বাড়াতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। নন্দীগ্রাম আন্দোলন সূত্রে ৯৪টি মামলার তালিকা পেশ করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে বিচার্য মামলাগুলি প্রত্যাহারের সুপারিশ নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

ষষ্ঠ বৈঠকে বলা হচ্ছে (২.৯.১১), পঞ্চম বৈঠকে উল্লিখিত ২৬৭ জন রাজনৈতিক বন্দির তালিকা নিয়ে 'কিছু বিভ্রান্তি' তৈরি করা হয়েছে। কমিটির বর্তমান সচিব তথা নতুন আইজি (কারা) বিষয়টি 'ব্যাখ্যা' করেছেন। 'এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই'। কিন্তু প্রথম বৈঠকের কার্যবিবরণীতে কোথাও ২৬৭ রাজবন্দির কথা নেই। ৮৩ জনের জেলওয়াড়ি তালিকা রয়েছে। সচিব-কৃত সরকারি সংক্ষিসারে 'বিভ্রান্তি ও ব্যাখ্যা' সম্পূর্ণ অনুল্লিখিত। রহস্যটা কী? প্রথম তালিকায় রাজনৈতিকভাবে অবাঞ্ছিত বা পোষ-না-মানা বন্দির নাম ঢুকে পড়েছিল কী? উত্তর মেলেনি। কার্যবিবরণী অনুযায়ী কমিটি সদস্য সুজাত ভদ্র কমিটি গঠনের সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত (এফ) বিচার্য বিষয়টি (রাজবন্দি দ্বারা মুক্তির পর একই ধরনের অপরাধ ফের করার সম্ভাবনা বিচার) বাদ (omit) দেওয়ার কথা বলেন। 'এফ'-এর বিষয়বস্তু কার্যবিবরণীতে অনুল্লিখিত। এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়।

সপ্তম বৈঠকে (২৩.৯.১১) সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে দায়রা ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাগুলির তালিকা বিচার এবং প্রথমোক্ত মামলাগুলি কোর কমিটি দ্বারা মূল্যায়ন ও শেষোক্ত মামলাগুলি প্রত্যাহারের সুপারিশ বলবৎ থাকে। ১০৬ জন বন্দীর রাজনৈতিক বন্দির স্বীকৃতি সংক্রান্ত আবেদনের পাশাপাশি ১৪২ জনের তালিকা পেশ হয়। 'বিভ্রান্তি' থাকে আগের ১০৬ জন এই ১৪২-এর অন্তর্ভুক্ত কিনা। ফলে একটি সঠিক তালিকা চাওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেল ঘুরে এসে সুজাত ভদ্র জানান, ওইসব জেলে বন্দিদের ক্ষেত্রে মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করার পর ১২ জন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। টম অধিকারী (কেএলও নেতা) সহ পাঁচজনের আবেদন নিম্ন আদালতে খারিজ হওয়ায় তাঁরা উচ্চ আদালতে গেছেন। বংশীবদন বর্মন সহ ৩২ জনের (গ্রেটার কোটবিহার আদালতের নেতা-কর্মী) বিরুদ্ধে রুজু মামলাগুলি প্রত্যাহারের সুপারিশ সত্ত্বেও তাঁরা জামিন পাননি। তাঁরাও হাইকোর্টে গেছেন। সুজাত ভদ্র উল্লিখিত 'এফ' সংক্রান্ত আপত্তি বিষয়ে কোনও আলোচনার কথা কার্যবিবরণীতে নেই।

অষ্টম বৈঠকে (২.১১.১১) কাগজে বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ১৫০ বন্দির রাজনৈতিক মর্যাদা চেয়ে আবেদনপত্র মিলেছে। ১০৭ জন বিচারাধীন ও ৪৩ জন সাজাপ্রাপ্ত। নন্দীগ্রামে দায়রা মামলাগুলিকেও দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে— মানুষের উপর শারীরিক আক্রমণ এবং সম্পত্তি নষ্টের অপরাধে তা বিভক্ত। কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যাহারের সুপারিশ এবং বাকি ক্ষেত্রে পর্যালোচনা চলবে। ছয়টি মামলায় সিবিআই ও সিআইডি তদন্ত চলায় এ নিয়ে সিদ্ধান্ত মুলতুবি থাকে।

নবম বৈঠকে (১৮.১১.১১) নন্দীগ্রামে মামলার চরিত্র/গুরুত্ব অনুযায়ী বিচার ও প্রত্যাহার ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ভাগাভাগি অব্যাহত। রাজবন্দির স্বীকৃতি সংক্রান্ত ৫০টি মামলার নথিপত্র প্রসিকিউশন অধিকর্তার কাছে চাওয়া হয়।

দশম বৈঠকে (১৯.১২.১১) নন্দীগ্রাম মামলাগুলির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া জারি। কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত।

একাদশ বৈঠকে (১০.১.১২) আলিপুর অতিরিক্ত দায়রা জজের ফার্স্ট ট্র্যাকে আদালত এবং সপ্তম মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে রাজবন্দির স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দশজন (মাওবাদী অভিযোগে অভিযুক্ত) বন্দীর বিষয়ে নির্দেশনামা কমিটিকে জানানো হয়।

কমিটি এঁদের রাজবন্দির মর্যাদা দিয়ে আইনানুগ সুযোগসুবিধা পর্যায়ক্রমে জামিনের আবেদন ও মামলা প্রত্যাহারের আবেদনকে 'উদারভাবে দেখার' সুপারিশ জানায়। কমিটি সচিব তথা আইজি (কারা) জানান ৬৮৫টি মামলার তালিকাসহ কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। কমিটি সদস্যরা সরকারের তরফে সুপারিশগুলি সম্পর্কে 'ফলো আপ অ্যাকশন' সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এ বিষয়ে কমিটিকে অবহিত করার জন্য মুখ্যসচিবকে অনুরোধ করা হয়। কমিটি সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের জামিনে বা প্যারোলে ছাড়ার প্রস্তাব দেয়।

দ্বাদশ বৈঠকে (২৭.১.১২) সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের নিয়ে আলোচনা জারি থাকে। সুজাত ভদ্রের প্রস্তাব, রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের ১৯৯৯ সালের গাইডলাইন মতো সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ন্যূনতম দু'বছর জেলবন্দি থাকার পর তাকে মুক্তি দেওয়া হোক। কমিটি সত্তরোর্ধদের ক্ষেত্রে অসুস্থ ও ৫ বছরের বেশি সাজা খেটে থাকলেও সরকারি পদ্ধতি মোতাবেক মুক্তির সুপারিশ জানায়। কমিটির বেসরকারি সদস্যরা যে বিনা সাম্মানিকে কাজ করছেন সেটা নথিভুক্ত করা হয়। সরকারি বরাদ্দ ৪.৬৫ লক্ষ টাকা খরচ 'জটিল পদ্ধতিসাপেক্ষ' বলে ওই টাকা মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিলে বা বন্দি কল্যাণে ওই টাকা দানের সিদ্ধান্ত হয়।

পরবর্তী সভাগুলিতে কিছু 'আউটস্টান্ডিং' মামলার সিদ্ধান্ত হয়।

ত্রয়োদশ বৈঠকে (১৬.২.১২) সত্তরোর্ধ এবং ৫ বছরের বেশি সাজা খাটা ৫০ জন বৃদ্ধ বন্দির তালিকা রাজ্যপাল বা সরকারের কাছে পাঠিয়ে তাঁদের মুক্তির সুপারিশ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। অপরাপর মামলার বিষয়ে প্রাপ্ত নথিপত্র প্রসিকিউশন অধিকর্তার কাছে পাঠানো হয়।

চতুর্দশ বৈঠকে (১.৩.১২) বিভিন্ন মহলের আবেদনক্রমে সাজাপ্রাপ্ত বৃদ্ধ, অসুস্থ বন্দিদের মুক্তির সুপারিশের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা কমিয়ে যাট এবং ন্যূনতম সাজা খাটার পর্ব বাড়িয়ে সাত করা হয়। এছাড়া যেসব দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি জেল থেকে অনার্স বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে আট বছর জেল খাটার পর মুক্তির সুপারিশও থাকে। মাওবাদী নেতা কোবাদ গান্ধীর ১০ জুন ২০১১ সালের আবেদনপত্র এই বৈঠকে পেশ হয়। দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে একটি মামলায় তিনি অভিযুক্ত (শালবনী থানা কেস নম্বর ৮১/০৮)। কমিটি তাঁর নাম এফআইআর তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ জানায়। এই বৈঠকেই কমিটির সদস্যদের বিক্ষোভ নথিভুক্ত হয়। "যদিও এই কমিটি তার সুপারিশগুলি সম্পর্কে সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপগুলির বিষয়ে জানতে চেয়েছে, নির্দিষ্ট কোনও তথ্যই এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি (Nothing Concrete has yet been received)।" সুজাত ভদ্র এবং এইউসিআই-এর কয়েকজন নেতা বিচারাধীন বন্দীর একটি বৃহৎ তালিকা পেশ করেন। ভদ্র, দেবাশিস ভট্টাচার্য এবং আনসার মণ্ডল (অপর দুই সদস্য)— এই তিনজনের কোর কমিটি গড়া হয় প্রসিকিউশন অধিকর্তার সঙ্গে বসে ওই তালিকা খতিয়ে দেখার জন্য।

পঞ্চদশ বৈঠকে (২৩.৩.১২) সত্তরোর্ধদের তালিকা মিললেও আগের বৈঠকে আলোচিত বাকি সাজাপ্রাপ্তদের মামলা সংক্রান্ত তালিকা মেলেনি বলে সরকারি পক্ষকে তাগাদা দেওয়া হয়। সুজাত ভদ্র, দেবাশিস ভট্টাচার্য, রাজদীপ মজুমদার (অপর সদস্য) আরও জেল পরিদর্শনে যাবেন বলে অনুমতির ব্যবস্থা করতে বলা হয়।

ষোড়শ বৈঠকে (২০.৪.১২) যদিও কমিটি আগে কিছু সাজাপ্রাপ্ত বন্দির ক্ষেত্রে মুক্তির সুপারিশ করেছিল, এ দফায় কিছু সদস্য আপত্তি জানান যে সরকার এই কমিটিকে সাজাপ্রাপ্তদের বিষয়ে বিবেচনার অধিকার (mandate) দেয়নি। এই সদস্যরা কারা, তা নিয়ে কার্যবিবরণী নীরব। কমিটির সামনে হাজির সাজাপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্ত ১৬০ জনের মামলা বিষয়ে আরও আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়। আইজি(কারা)-র কাছে রিপোর্ট চাওয়া হবে 'রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রে দণ্ডপ্রাপ্ত'দের বিষয়ে। নন্দীগ্রামের দায়রা মামলাগুলির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত।

২০১২ আগস্টে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়ার আগে কমিটির আরও সভা হয়ে থাকলেও তার কার্যবিবরণী মেলেনি। এই বিবরণী থেকে স্পষ্ট : জঙ্গলমহলের আন্দোলন সূত্রে জেলবন্দি এবং মামলার সংখ্যা ওই পর্বে সর্বাধিক হলেও তা নিয়ে কোন আলোচনা কমিটিতে হয়নি বা সুপারিশ হয়নি। সরকার পক্ষ রাজনৈতিক বন্দির প্রকৃত সংখ্যা (আদালত ও আইজি-স্বীকৃত) তথা সরকার নিয়ে লাগাতার বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। ২৬৭ জনের প্রাথমিক তালিকা কী করে ৭৮ জনে নেমে গেল তার কোনও সদুত্তর মেলেনি। কমিটি সদস্যরা এর ব্যাখ্যা চেয়েছেন বলেও প্রাপ্ত নথিতে উল্লেখ নেই। মানবাধিকার আন্দোলনে অন্যতম প্রধান বিতর্কিত ইস্যু: কমিটির বিবেচ্য বিষয়ের তালিকাভুক্ত 'বন্দির ভবিষ্যৎ আচরণ' সংক্রান্ত শর্ত নিয়ে কোনও বিশদ আলোচনা হয় নি। শর্তটি বাদও যায়নি। দক্ষিণবঙ্গের জেলগুলিতে রাজবন্দি, বিশেষত মাওবাদী এবং অপরাপর নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য-সমর্থক সন্দেহে বন্দিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, রাজদ্রোহ, রাষ্ট্রদ্রোহের মামলাগুলি নিয়ে কোনও আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। অথচ রাজনৈতিক অপরাধ সম্পর্কিত ফৌজদারি দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা তথা ইউএপিএ ইত্যাদি আইন এঁদের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য হয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, পূর্বতন আমলের বামফ্রন্ট-বিরোধীরা অনেকেই ছাড়া পেলেও রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল সরকারের চক্ষুশূল, বিরোধী বা সম্ভাব্য বিরোধী বন্দিদের মুক্তির বিষয়গুলি কমিটির সামনে বিবেচনার জন্য সরকারপক্ষ পেশই করেনি। কমিটির বেসরকারি সদস্যরাও এ নিয়ে সরকারপক্ষকে চেপে ধরেছেন এমনটা কার্যবিবরণীতে নেই। বস্তুত মামলার আইনি জটিলতা ব্যতিরেকে রাজ্য কারা আইনের ২৪ নং ধারার ভিত্তিতে আদালত ভিন্ন সরকারের সিদ্ধান্তে কারা রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন বা পেতে পারেন, তার কোনও স্পষ্ট নীতিগত ঘোষণা সরকারপক্ষ কমিটিকে জানায়নি। কমিটির বেসরকারি সদস্যরাও এই প্রশ্নে সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। অন্তত সরকারি কার্যবিবরণীর প্রকাশ্য বয়ানে এ বিষয়ে তাঁদের মতামতের কোনও উল্লেখ নেই।

প্রবন্ধ

যুগান্তকারী সংকট

জন বেলামি ফস্টার

মহামন্দার (The Great Depression) পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা, অনেকে যাকে দ্বিতীয় মহামন্দা বলছেন, তা আজ আরও বড় এক সর্বনাশের ছায়ায় ম্লান হয়ে গিয়েছে, যে সর্বনাশের ফলে মানুষসহ অগণিত প্রজাতির দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বই এক বিরাট প্রশ্ন-চিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মানবজাতি কী বিশাল ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এটা তারই লক্ষণ। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধনশীল অচলাবস্থা ও দ্রুতহারে-বেড়ে-চলা পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশঙ্কার আন্তসম্পর্কটিকে বোঝা তাই আজ প্রতিটি মানুষের জরুরি প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশঙ্কাটি পুঁজিবাদী বিকাশেই উপজাত।

অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দ্বন্দ্বগুলি এমনভাবে একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে যে সমাজের বস্তুগত অবস্থা ভেতর থেকে ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং একটি নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় ঐতিহাসিক উত্তরণের প্রশ্নটি সামনে আসছে। একেই আমি 'যুগান্তকারী সংকট' বলেছি। পুঁজিবাদের ইতিহাসে বারবার উঠে আসা সাধারণ বিকাশের সংকটগুলির থেকে এই সংকট আলাদা। জেসন মুর যেমন বলেছেন, সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের কালে মধ্যযুগের শেষ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এমনই এক যুগান্তকারী সংকট—যা ছিল এক ঐতিহাসিক কাল জুড়ে ব্যাপ্ত, যার প্রকাশ ছিল একই সঙ্গে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, এবং যার লক্ষণগুলি ছিল বারবার দুর্ভিক্ষ, কালো মহামারী (Black Death), ভূমির বন্ধ্যাত্ব, এবং যুদ্ধবিগ্রহের তীব্রতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি। আমার মতে, আজকের সংকট সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের সংকটের থেকেও অনেক বেশি গুরুতর। এই সংকটের জন্ম এক বল্‌গাহীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৃদ্ধিতে, যার লক্ষ্য হলো অধরা সম্পদবৃদ্ধির অনন্ত প্রক্রিয়া।

অর্থনৈতিক কল্পকাহিনীতে যেমন বলা হয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং বিনিময় তেমন সরল পণ্য উৎপাদনের চেহারা নেয় না, অর্থাৎ C-M-C চক্রে আবর্তিত হয় না। [এখানে C হল একটি পণ্য যা এক নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যবহার-মূল্যকে বোঝায়, M হলো অর্থ যার বিনিময়ে ঐ ব্যবহার-মূল্যের হাতবদল হয়, এবং সবশেষে C হলো ভিন্ন একটি ব্যবহার-মূল্য যার সঙ্গে M-এর বিনিময় হয় এবং তা শেষে ব্যবহৃত হয়] বরং মার্কস যাকে 'পুঁজির সাধারণ ফর্মুলা' বা M-C-M' বলেছিলেন, তেমনই অর্থ (M) শ্রমশক্তি ও কাঁচামালের সঙ্গে বিনিময় হয় করে তৈরি হয় পণ্য এবং সেই পণ্য (C) আরও বেশি অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয় [$M' = M + \Delta m$ বা উদ্বৃত্ত মূল্য]। অর্থাৎ যা নির্দিষ্ট গুণগত প্রয়োজন মেটায় সেই *ব্যবহার-মূল্য নয়*, পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্য হলো *বিনিময়-মূল্য*, যা পুঁজিবাদীকে মুনাফা এনে দেয়। প্রক্রিয়াটির এই নৈর্ব্যক্তিক, পুরোপুরি পরিমাণজ্ঞাপক চরিত্রের মানে হলো, আরও আরও অর্থ বা উদ্বৃত্ত-মূল্য চাওয়ার কোনো শেষ নেই। কারণ M' থেকে শুরু হয় পরবর্তী উৎপাদন চক্র, যার থেকে পাওয়া যাবে M'', তারপর আবার M''' পাওয়ার জন্য তার পরবর্তী চক্র। এইভাবে এক অন্তহীন ধনসঞ্চয় ও ধন-স্ফীতি চলতেই থাকে।

একচেটিয়া পুঁজিবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এই উৎপাদন প্রক্রিয়াটি আরও বিকৃত হয়ে পড়ে। কারণ প্রাকৃতিক-বস্তুগত ব্যবহার মূল্যগুলিকে হটিয়ে দিতে থাকে বিশেষভাবে *পুঁজিবাদী ব্যবহার-মূল্য*। এই পুঁজিবাদী ব্যবহার-মূল্যগুলির একমাত্র বাস্তব 'ব্যবহার' হল পুঁজিবাদীদের জন্য বিনিময়-মূল্য বাড়িয়ে চলা। এর ফলে ক্রমাগত অপ্রয়োজনীয় ও ধ্বংসাত্মক পণ্যের উৎপাদন বেড়ে চলে— যার মধ্যে সামরিক সম্ভার থেকে ছোটখাটো বদল করে গাড়ির নতুন মডেল, অত্যধিক মোড়ক ব্যবহার— সবই আছে। এখানে মার্কসের উৎপাদন-সংক্রান্ত পুঁজির সাধারণ ফর্মুলাটি বদলে হয়ে যায় $M\text{-}C^k\text{-}M'$, যেখানে C^k হলো বিশেষভাবে পুঁজিবাদী ব্যবহার মূল্য।

বর্তমান অর্থব্যবস্থার আকাশছোঁয়া স্তরে, পুঁজির সাধারণ ফর্মুলা M-C-M' ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে ফাটকা পুঁজির চক্র M-M'-এ, যেখানে ব্যবহার-মূল্যের উৎপাদনই আর থাকছে না, অর্থই সরাসরি আরও বেশি অর্থের জন্ম দিচ্ছে। অর্থনীতিবিদ্‌রা যাকে বলেন 'সত্যিকারের অর্থনীতি', GDP-র সঙ্গে সম্পৃক্ত পণ্য উৎপাদনের সেই ক্ষেত্রটি ক্রমশ আজকের একচেটিয়া লগ্নি-পুঁজির লগ্নিসম্পদ বৃদ্ধির অযৌক্তিক নিয়মের অধীন হয়ে পড়ছে, যাতে ঐ লগ্নি-পণ্যের দাম দিন বেড়ে চলে এবং যা একের-পর-এক অর্থনৈতিক বুদবুদের উপর নির্ভরশীল। লগ্নিপুঁজির দাপট বেড়েই চলেছে, এবং তা পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবহার-মূল্যের সত্যিকারের অর্থনীতি থেকে মূলত বিযুক্ত।

বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী মূল্য-সম্পর্কের জালের পিছনে রয়েছে কোটি কোটি দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষ, যাঁরা প্রায়ই জীবনধারণের একেবারে প্রাথমিক উপকরণগুলি থেকেও বঞ্চিত— যেমন খাদ্য, জল, পোশাক, বাসস্থান, জীবিকা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অবিষাক্ত একটি পরিবেশ। এর কারণ পুঁজিসঞ্চয়ের অন্তর্লীন স্ববিরোধ এবং ব্যর্থতা। অন্যদিকে, পরিবেশবিদ্‌রা যাকে বলেন

'সত্যিকারের সম্পদ', অর্থাৎ প্রকৃতির নিজস্ব উপজাতগুলি, দিন দিন শোষিত হচ্ছে আরও আরও বেশি হারে, উৎপাদনের যাথার্থ্য বা প্রাকৃতিক পরিবেশগুলির সহনশীলতার কোনও তোয়াক্কা না করেই। লুঠ হয়ে যাচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্পদ। প্রকৃতি ও শ্রম উভয় ক্ষেত্রেই যেহেতু আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এক অসম বিনিময় সম্পর্ক বজায় রয়েছে, এই লুঠের প্রভাব অসমান ভাবে দরিদ্রতর রাষ্ট্রগুলির ঘাড়ে গিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রাকৃতিক ব্যবহার-মূল্যের এক অংশ (অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তেরও) ধারাবাহিকভাবে শোষিত হয়ে যায় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পিরামিডের শীর্ষে থাকা দেশগুলির দ্বারা, তাদের আরও ধনী করে তুলতে।

সর্বত্রই একচেটিয়া লগ্নিপুঁজির সংকীর্ণ যুক্তিবিন্যাসের সঙ্গে বস্তুগত সম্পর্কগুলির সংঘাত বাঁধছে। সত্যিকারের উৎপাদন ও সত্যিকারের সম্পদ— অর্থাৎ ব্যবহারমূল্য, মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকা এবং বেঁচে থাকাটাই— ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এক সামাজিক-পরিবেশগত অসুস্থতা সৃষ্টি হচ্ছে ও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সামির আমিন তাঁর 'মার্কসের মূল্য তত্ত্বের উপর তিনটি নিবন্ধ' (২০১৩) বইটিতে লিখছেন, ''একবিংশ শতকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা মানবজাতি ও সমগ্র বিশ্বের নিরিখে সামাজিক অযৌক্তিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।'' এই কথার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে পুঁজিবাদের এই যুগান্তকারী সংকটের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত মাত্রাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক মাত্রা

যুগান্তকারী সংকটের অর্থনৈতিক মাত্রাটি তিনটি ঝোঁকের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়, যে ঝোঁকগুলি আবার পরস্পরকে শক্তিশালী করে। ঝোঁকগুলি হল একচেটিয়াকরণ, বদ্ধাবস্থা এবং আর্থিকীকরণ (উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিবর্তে ফাটকায় বা অর্থবাজারে বিনিয়োগ— অনুবাদক), যার সঙ্গে আরও যুক্ত হয় বিশ্ববাজারব্যাপী সস্তা শ্রম কেনাবেচা। উনবিংশ শতকের শেষভাগ এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগ ধরে পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তরটি ক্রমশ পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও ঘনীভবনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটি আদর্শস্থানীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এখন প্রায় একচেটিয়া বা অল্প কিছু ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন— দাম, উৎপাদন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যার অনেকখানি একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে। উৎপাদন ক্ষেত্রের শিল্পগুলি ভীষণভাবে কেন্দ্রীভূত। অল্প কয়েকটি অতিকায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান প্রভূত একচেটিয়া আয় থেকে লাভবান হয়। অর্থবিনিয়োগ ক্ষেত্রেও একই অবস্থা— চারটি বৃহৎ মার্কিন ব্যাংক দেশের প্রায় অর্ধেক ব্যাংকিং সম্পদ কব্জা করে রেখেছে। ২০০৭ সালে, বিরাট আর্থিক সংকটের সূচনায় দুশো সর্ববৃহৎ মার্কিন কর্পোরেশন অর্থনীতির মোট মুনাফার ৩০ শতাংশেরও বেশি অর্জন করত, যা ১৯৫০ সালে ছিল ১৩ শতাংশ। পৃথিবীব্যাপী ৫০০টি সর্ববৃহৎ কর্পোরেশন পৃথিবীব্যাপী মোট আয়ের ৩৫-৪০ শতাংশ দখল করছে, যা ১৯৬০ সালে ছিল ২০ শতাংশেরও কম। যাকে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা বলা হচ্ছে তা আসলে হলো একচেটিয়া ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বব্যাপী তীব্র রেষারেষি, যারা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দাম ঠিক করছে, আবার অন্যদিকে দাম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

পৃথিবীর উপর চড়ে বসা এইসব দানবীয় কর্পোরেশনগুলির মুনাফার হার বেড়েই চলেছে, তৈরি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান অসাম্যের সমস্যা এবং উদ্বৃত্ত পুঁজি শোষণ। পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রস্থলে সঞ্চয়ের সামগ্রিক হার শ্লথ হয়ে আসছে। দ্রুত বৃদ্ধি নয়, বরং বদ্ধাবস্থাই একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক অবস্থা, যা মাঝেমাঝে বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক কারণে কেটে যায় (যেমন যুদ্ধ, কোন যুগান্তকারী আবিষ্কার, বিক্রয় প্রচেষ্টা এবং আর্থিকীকরণ বা financialization)।

যাকে পল সুইজি বলেছিলেন 'পুঁজি সঞ্চয় প্রক্রিয়ার আর্থিকীকরণ', বিগত দশকগুলিতে এই গভীর হওয়া অর্থনৈতিক বদ্ধাবস্থার দশায় একচেটিয়া পুঁজি তারই শরণ নিয়েছে। হাতে-থাকা সম্ভাব্য বিশাল অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত লাভজনকভাবে ব্যবহার করার অসুবিধার জন্য বৃহৎ কর্পোরেশন ও ধনী বিনিয়োগকারীরা তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি বেশি বেশি করে লগ্নিক্ষেত্রে ঢেলে দিয়েছে, যাতে ফাটকা খেলে বিরাট লাভ করা যায়। আর্থিক সংস্থাগুলি এই বর্ধিত চাহিদায় সাড়া দিয়ে অন্তহীনভাবে নতুন বিচিত্র সব ফাটকাবাজির উপকরণ যুগিয়ে চলেছে (জাঙ্ক বন্ড, ডেরিভেটিভ, অপশন, হেজ ফানজ প্রভৃতি। ফল— ঋণ বিস্ফোরণ। এমনকি পণ্য উৎপাদক কর্পোরেশন-গুলিও (যেমন জেনারেল ইলেকট্রিক বা জেনারেল মোটর্স) লগ্নিক্ষেত্রে এই লাভের বখরা পেতে অর্থলগ্নি বিভাগ তৈরি করেছে। ফলস্বরূপ তৈরি হচ্ছে একের পর এক আর্থিক বুদবুদ, যা অর্থনীতিকে একটু ঠেলে তুলছে বটে, কিন্তু সমগ্র ব্যবস্থাটাকে করে তুলছে আরও ভঙ্গুর। পরিণামে এই নতুন আর্থিক উপরিকাঠামো নিজের গতিতে চলছে এবং উৎপাদনের উপর আধিপত্য করছে। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াটি ক্রমে ক্রমে কর্পোরেট বোর্ড থেকে সরে অর্থলগ্নিবাজারে থিতু হচ্ছে।

একচেটিয়া লগ্নিপুঁজির বর্তমান দশায় অর্থব্যবস্থার নিয়ম এমনই যে, প্রচলিত পুঁজি সঞ্চয়ের বাস্তব-পুঁজি-সৃষ্টি-কেন্দ্রিক পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটি আর্থিক-সম্পদ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ধনসঞ্চয়ের এক বিমূর্ত প্রক্রিয়ার অধীন হয়ে পড়ছে। M-C-M'-এর জায়গায় আসছে M-M', যে সম্ভাবনার কথা মার্কস বলেছিলেন, কেইনস যাকে ভয় পেতেন।

আন্তর্জাতিক স্তরে প্রক্রিয়াটি বিশ্বব্যাপী শ্রম কেনাবেচনার

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেখানে দানবীয় বহুজাতিক সংস্থাগুলি পৃথিবী জুড়ে সবথেকে কম দামি শ্রম খুঁজে বার করে তার শিল্পোৎপাদনের সিংহভাগ দক্ষিণাংশের দেশগুলির রপ্তানি অঞ্চলে নিয়ে যাচ্ছে এবং ফলস্বরূপ কতিপয় রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতি ফুলেফেঁপে উঠছে। ক্রমশ তীব্রতর হয়ে ওঠা অসম অর্থনৈতিক বিনিময়ের (যেখানে মজুরির পার্থক্য উৎপাদনশীলতার পার্থক্যের থেকে বেশি) এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী উৎপাদন সম্পর্কগুলি গেড়ে বসছে। এমতাবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলির (চীন বাদে) গড় বার্ষিক মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১৯৭০-১০৮৯ কালপর্বে যা ছিল G-7 দেশগুলির মাত্র ৬.১ শতাংশ, এবং ১৯৯০-২০০৬ পর্বে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫.৬ শতাংশে (মহা আর্থিক সংকটের ঠিক আগে)।

পরিবেশগত মাত্রা

এই যুগান্তকারী সংকটের পরিবেশগত মাত্রাটি মার্কসের প্রকৃতি ও সমাজের বিপাকের বিশ্লেষণের আলোয় সব থেকে ভালো বোঝা যায়, যখন এই বিশ্লেষণটিতে একচেটিয়া পুঁজিবাদের উৎপাদন সম্পর্কগুলিও ধরে নেওয়া হয়। মার্কসের ধারণায় 'প্রকৃতির সর্বজনীন বিপাক ক্রিয়ার' মধ্যেই উৎপাদন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিরাজ করেছে। 'প্রাকৃতিক জগৎ' থেকে বস্তুগত ব্যবহার-মূল্যগুলি আহরণ করা হতো এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক ব্যবহার-মূল্যে পরিবর্তিত হতো, যাতে তা ''মানুষের প্রয়োজনের'' উপযোগী হয়। এই ছিল ''প্রকৃতি ও মানবের বিপাকীয় আন্তঃসম্পর্কের সর্বজনীন অবস্থা এবং ফলত মানবজীবনের প্রাকৃতিক অবস্থা''। ''জলে মাছ ধরা, আদিম অরণ্যের বৃক্ষ উৎপাদন, বা ভূগর্ভ থেকে আকরিক তুলে আনা''— মার্কস যাকে বলতেন 'নিষ্কাশন শিল্প, তা ছিল প্রাকৃতিক ব্যবহার-মূল্য (সত্যিকারের সম্পদ)। প্রকৃতির দান এবং শ্রম-নিরপেক্ষ। 'পুঁজি' গ্রন্থে তিনি লিখছেন, ''একদিকে এই পৃথিবী, অন্যদিকে শ্রম... হলো যে-কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার বস্তুগত উপাদান'', যে উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রকৃতির সর্বজনীন বিপাক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাই 'সামাজিক চেহারা' নিতে পারে না। যে মৌলিক প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সমাজকে মানিয়ে চলতেই হবে, সেই বিষয়ে ধারণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে পুঁজিবাদের ''জীবনেরই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি'' লঙঘনের সঙ্গে সম্পর্কিত ''সামাজিক বিপাকক্রিয়ার পরস্পর নির্ভরশীল প্রক্রিয়াগুলির ভেতর অনপনীয় বিরোধ'-এর সমালোচনা নির্মাণ করতে। শিল্প-পুঁজিবাদের অন্দরে সমাজ ও প্রাকৃতিক বিপাকক্রিয়ায় এই বিরোধ এমনই ব্যাপক চেহারা নেয় যে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও বিস্তৃত হয়; পরিবেশ-সাম্রাজ্যবাদের প্রক্রিয়ায় কিছু দেশ অন্যান্য দেশের মাটিও লুঠ করছিল। এই লুঠের ফলে মাটি থেকে তার সার খাদ্য ও তন্তু হিসেবে শুষে নিয়ে শহরে চালান করা হচ্ছিল এবং ফলস্বরূপ শহরগুলিও দূষিত হচ্ছিল।

মার্কস এই যে প্রকৃতি ও সমাজের বিপাকক্রিয়ার যে বিশ্লেষণ হাজির করলেন, তা আজকের এই যুগান্তকারী সংকটে কীভাবে ব্যবহার করা যাবে? উপরে বর্ণিত মার্কসের ধারণাকে ব্যবহার করে এবং আজকের পরিবেশগত সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করে প্রচুর কাজ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি ও সমাজের পণ্য-সম্পর্কিত বিশ্লেষণ, যেগুলি বিশেষত ব্যবহারমূল্য উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা করেছে, পরিবেশ প্রসঙ্গে খুব কমই আলোচিত হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, পরিবর্তিত ব্যবহার-মূল্যের অর্থনৈতিক ধাঁচাটি এই গ্রহের পরিবেশ ধ্বংসসাধনে কীভাবে ক্রিয়াশীল। এক্ষেত্রে মার্কস নিজেই কয়েকটি সরাসরি সূত্র ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি যদিও এক পুঁজিবাদী ব্যবহার-মূল্যের অস্তিত্ব নির্দেশ করেছেন (যেমন তালা প্রস্তুতকারক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উদ্ভূত অপরাধ থেকে উপকৃত হয়) এবং আরও কিছু ''ব্যবহার-মূল্যের'' কথা বলেছেন যেগুলি ''প্রয়োজনের তালিকায় উপরের দিকে থাকে'' (অর্থাৎ, সামাজিক প্রয়োজনেরও উত্তরণ রয়েছে)। কিন্তু তিনি ব্যবহার-মূল্যের ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত এইসব ঘটনাবলীকে প্রণালীবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করেননি, কারণ তাঁর সময়ের প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদে এগুলি তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন ছিল।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যবহার-মূল্যের পরিবর্তনশীল এই কাঠামোটির পরিবেশগত তাৎপর্যের অর্থ খুঁজতে হবে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ থেকে একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিবর্তনে— যা মার্কসের সময়ের পর ঘটেছে। বিংশ শতকের গোড়ায় (১৯২৩ সালে) থর্নস্টাইন ভেবলেন তাঁর বই *Absentee Ownership and Business Enterprises in Recent Times*-এ এই বিশ্লেষণের মূল রূপরেখাগুলি দিয়ে গেছেন। ভেবলেনের যুক্তি হলো, বর্জ্য উৎপাদন— যার সংজ্ঞা তিনি তাঁর *The Theory of the Leisure Class*-এ দিয়েছেন: ''এমন ব্যয় যা মনুষ্য-জীবনের বা মানুষের উপকারে আসে না''— নয়া কর্পোরেট অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, কারণ এ হল সীমিত চাহিদার বিপরীতে বিক্রয় ও লাভ বাড়ানোর উপায়। এই ধরনের অনুৎপাদক খরচ সমগ্র উৎপাদন-কাঠামোর এত গভীরে ঢুকে গেছে যে, তিনি বলছেন, ''কর্মদক্ষতা ও বিক্রয়কৌশলের তফাৎ ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে গেছে... এবং বর্তমানে নিঃসন্দেহে বাজারের জন্য তৈরি বহু জিনিসের বিক্রয়মূল্যের প্রধান অংশই হলো বিক্রিযোগ্য ও চটকদার বহিরঙ্গ উৎপাদনের খরচ।''

পল বারান ও পল সুইজি এই চিন্তাকে আরও প্রসারিত করেন তাঁদের *Monopoly Capital* (১৯৬৬) গ্রন্থে। মার্কস

ও ভেবলেন, দুজনকে ভিত্তি করে তাঁরা অর্থনৈতিক বর্জ্য বৃদ্ধিকে উদ্বৃত্ত শোষণের একটি উপায় হিসেবে বিশদ ব্যাখ্যা করেন— সামরিক ব্যয়ে, বিক্রি বাড়ানোর বিভিন্ন পন্থায়, এবং (অর্থ লগ্নি, বিমা ও ভূসম্পত্তি বা Finance, Insurance, Real Estate— FIRE)-এর মতো বিভিন্ন রূপে। তাঁরা জোর দিয়ে বললেন যে, একচেটিয়া পুঁজিবাদে বিক্রির নানা পন্থা এতটাই ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গিয়েছে যে অর্থনীতির ব্যবহার-মূল্যের কাঠামোকে আর উৎপাদন ব্যয়ের যুক্তিসম্মত প্রকাশ হিসেবে দেখা যায় না। যাকে তাঁরা বলেছেন ''পারস্পরিক পরিব্যাপ্তির পরিণাম'' (Interpenetration effect), তার অর্থ বিক্রয়ের খরচ এবং উৎপাদন ব্যয় পরস্পর মিশে যাওয়া। এর ফলে যাকে উৎপাদন ব্যয় বলে ভাবা হতো তার এক ক্রমবর্ধমান অংশ বাস্তবে হলো উৎপাদন ব্যবস্থার চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন জঞ্জাল, অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে পুঁজিবাদী ব্যবহারমূল্য (C^k)। দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যগুলিকে ইচ্ছে করেই এমনভাবে তৈরি করা হতে লাগল যাতে সেগুলি অচিরেই বাতিল হয়ে যায়। আর ভোগ্যপণ্যগুলি এমনভাবে বিশাল খরচ করে পরিকল্পনা করা হলো যাতে চরম অধিকারলিপ্সু মানসিকতার ক্রেতা গজিয়ে ওঠে। দানবীয় কর্পোরেশনগুলির রাজত্বে বিক্রি সংক্রান্ত এইসব অনুৎপাদক ব্যয়ের খরচ জোগানো ছাড়া অন্য কোন উপায় রইল না ক্রেতার— কারণ সবথেকে জরুরি পণ্যগুলির দামেও এই সব খরচগুলি ধরা থাকে, তা ছাড়া কিছু পাওয়াই যায় না। একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এ সবই 'যুক্তিপূর্ণ' এবং 'কাজের', কারণ এই অর্থনীতি ক্রমাগত চাহিদাহীন বাজার, ধীর বৃদ্ধি ও বেকারি/আংশিক বেকারি-তে ভুগছে।

তাহলে একচেটিয়া পুঁজিবাদের সমালোচনার মৌলিক সমস্যা হলো, যেমন বারান ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ একটি চিঠিতে সুইজিকে ব্যাখ্যা করেছেন, ''উৎপাদন যার জন্য দায়ী সেই ভুলভাবে ব্যবহৃত জোগান, আর 'ভুলভাবে ব্যবহৃত' বলতে বোঝাচ্ছি মার্কসীয় অর্থে শোষিত আর আমাদের অর্থে নষ্ট [অর্থাৎ, ''মানবের স্বাস্থ্য, সুখ ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সহায়ক না''], এবং কেইনসীয় অর্থে বেকার।'' ''সমালোচনার এবং নেতিবাচক'' দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে এর মানে দাঁড়ায়, ''চেজ-মানহাটানের অট্টালিকাগুলির মতো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দুঃস্বপ্ন নয়, ষাট মিলিয়ন মূল্যের যন্ত্রচালিত দানব নয়, সুপার-হাইওয়ে ও বিজ্ঞাপনের বোর্ড দিয়ে দেশকে ধর্ষণ নয়।'' এইভাবে কত কাঁচামাল (imput) নষ্ট হয় ও তার ফলে কতখানি অর্থনৈতিক (এবং পরিবেশগত) ক্ষতি হয় তা সম্পূর্ণ হিসেব করবার কোন সম্ভবপর প্রকরণ নেই। কিন্তু এই ঘটনার বিপুলতা ও প্রাধান্য অস্বীকার করা যাবে না। মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম আরও একটি যুক্তিপূর্ণ সমাজ, টিকে থাকতে সক্ষম সমাজ সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বিশাল পরিমাণ অনুৎপাদক খরচগুলি। বারান ও সুইজির *Monopoly Capital* গ্রন্থকে ভিত্তি করে, যাকে পিটার কাস্টার্স তাঁর *Questioning Globalized Militarism* (২০০৬) বইয়ে বলেছেন 'ঋণাত্মক ব্যবহার-মূল্য', প্রতি বছর তা আজ শুধু মার্কিন কোটি কোটি কোটি ডলার মূল্যের যুদ্ধযন্ত্রে স্পষ্ট। আর প্রতিদিনের ব্যবহার্য উৎপাদিত সামগ্রীও যেরকম প্রায়ই দারুণ বিষাক্ত— তাতেও তা স্পষ্ট হয়।

এসব কিছুই জুলিয়েট শোরের বলা ''বস্তুত্বের কূটাভাস ''materiality paradox''-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শব্দবন্ধটির ব্যাখ্যা এই যে, আমরা যা উৎপাদন করি এবং ভোগ করি তা বস্তুর ব্যবহার-মূল্য দিয়ে কম নির্ধারিত হচ্ছে— বরং নির্ধারিত হচ্ছে সামাজিক স্তরভেদ ও মানসিক চাহিদা নিবৃত্তি আরোপিত প্রতীকী মূল্য দ্বারা; এসবই আমাদের শেখাচ্ছে আধুনিক বিপণন। যেমন রেমন্ড উইলিয়ামস ঘোষণা করেছিলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্যাটি— ''আমরা খুব বস্তুবাদী'', এমন নয়, বরং ''আমরা যথেষ্ট বস্তুবাদী নই।'' এক প্রবল-ভোগী, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নষ্ট করা সমাজ, যেখানে পণ্যের দুনিয়া বিজ্ঞাপনের অভিঘাতে এক 'জাদু রাজ্যে' পাল্টে গেছে, যে-সমাজে প্রতীকী প্রয়োজনের পেছনে ছুটে মরাই মোক্ষ, তা অবশ্যম্ভাবীরূপে তার পরিবেশকে ধ্বংস করবেই।

আধুনিক উৎপাদনের ব্যাপক পরিবেশগত যুক্তিহীনতা প্রাকৃতিক কাঁচামাল, বিশেষত শক্তির উৎসগুলিকে, প্রবলভাবে নষ্ট করে। ১৯৭৬ সালে দেওয়া ''Oil, Energy and Capitalism'' শীর্ষক বক্তৃতায় ব্যারী কমনার তর্ক তুলেছিলেন যে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ''সামাজিক ব্যবহার-মূল্যগুলি'' উৎপাদিত হয় শক্তি-নিবিড় (energy–intensive) এবং তাপগতিগতভাবে অদক্ষ উপায়ে, কেবলমাত্র শ্রমের খরচ বাঁচাতে। মার্কস যেমন সঠিকভাবে দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদ ক্রমাগত মজুরির হার বেঁধে রাখতে গিয়ে শ্রমকে উৎখাত করে। উদাহরণস্বরূপ, কমনার দেখিয়েছেন যে হাতব্যাগ আজকাল চামড়ার বদলে বেশি বেশি করে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হচ্ছে, যদিও পরেরটায় অনেক বেশি শক্তি খরচ হয়। কারণ হলো এতে শ্রমের খরচ কমে (যেহেতু জীবাশ্ম জ্বালানি শ্রমকে অপসারিত করে) এবং ফলত লাভের হারও বাড়ে। প্রবল হতে থাকা পরিবেশগত অবক্ষয়ের পাশাপাশি কর্মহীনদের এক ক্রমবর্ধমান সংরক্ষিত বাহিনী এই উৎপাদন-কাঠামোর সামাজিক যুক্তিহীনতা প্রমাণ করে।

বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা বোঝা জরুরি যে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রান্তদেশ উপরে বর্ণিত বেশির ভাগ (যদি সব নাও হয়) অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দ্বন্দ্বের শিকার;

আবার সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেওয়া অসাম্যেরও ভার তাকে বইতে হয়। বিশ্বের দক্ষিণ গোলার্ধের লুণ্ঠন কেবল অসম অর্থনৈতিক বিনিময়ের উপরই নির্ভর করেনি, বরং সর্বদাই অসম পরিবেশগত বিনিময়ের উপর নির্ভর করেই হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে বিংশ শতাব্দীর একজন অগ্রগণ্য বাস্তুতন্ত্রবিদ হাওয়ার্ড টি ওডাম অসম পরিবেশগত বিনিময় প্রক্রিয়ারও একজন অগ্রণী বিশ্লেষক ছিলেন। অংশত মার্কসের থেকে নেওয়া তাঁর পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তিনি যাকে বলেছিলেন ''সত্যিকারের সম্পদ'', যা প্রাকৃতিক বা সামাজিক উৎপন্নে শক্তি হিসেবে নিহিত থাকে। এর ভিত্তিতে ওডাম দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে বিশ্ব অর্থনীতির প্রান্তে প্রস্তুত পণ্যগুলি সাধারণত ভাবে কেন্দ্রে অবস্থিত দেশগুলির তুলনায় পরিবেশ থেকে বেশি শক্তি আহরণ করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যবিনিময়ের সময় প্রান্তীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে মূর্ত শক্তি বা সত্যিকারের সম্পদের নিট ক্ষতি হয়।

ওডাম লিখছেন, ''মুক্ত বাণিজ্য সমতাপূর্ণ বিনিময় নামক ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি এক নীতি। কিন্তু মুক্ত বাণিজ্য উন্নত দেশগুলিকে আরও ধনী করে তোলে, জীবনধারণের মান বাড়ায়, আর উন্নয়নশীল দেশগুলি ধ্বংস হতে থাকে।'' এর অন্তর্নিহিত কারণ হল প্রান্তে উৎপন্ন হওয়া বস্তুগুলিতে সাধারণত প্রকৃতির বিনামূল্যের উপহার (যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রমনির্ভর হিসেবে ধরা থাকে না) বেশি থাকে, যতটা কেন্দ্রীয় দেশগুলির উৎপন্ন পণ্যে থাকে না। উদাহরণস্বরূপ ওডাম হিসেব করে দেখিয়েছেন, ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে ইকুয়েডর তার আমদানির দশগুণ বেশি মূর্ত শক্তি রপ্তানি করেছে। এর বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই মুক্ত বাণিজ্যের ব্যবস্থায় তার আমদানির মাত্র অর্ধেক রপ্তানি করেছে (নেদারল্যান্ডস, জার্মানি ও জাপানের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা এরও সিকিভাগ)। বিশ্বের উত্তরভাগ ও দক্ষিণভাগের মধ্যে বাণিজ্য তাই তাঁর মতে ''সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ'', যাতে দরিদ্র দেশগুলির মূল্যে লাভ করে ধনী দেশগুলি। এই অসাম্য আরও বেড়ে ওঠে দূষণকারী শিল্পগুলি বিশ্বের উত্তরভাগ থেকে দক্ষিণভাগে চলে যাওয়ার কারণে। এতে উৎপাদনের বিষময় ফল যায় দক্ষিণে, আর বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির একচেটিয়া অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত মুনাফা হিসেবে যায় উত্তরে।

এক যুগান্তকারী বিপ্লব

উপরের বিশ্লেষণে আমার বক্তব্য ছিল যে আমাদের সময়ের এই যুগান্তকারী সংকট জন্ম নিচ্ছে এক মারাত্মক বিধ্বংসী অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ছেদবিন্দু থেকে। এর কারণ প্রাকৃতিক-বস্তুগত ব্যবহার-মূল্যগুলির ক্রমবর্ধমান বিকৃতি, স্থানান্তর এবং অধঃপতন। এটি শুধু সঞ্চয় প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সরাসরি যুক্ত নয়, ক্রমবর্ধমান আবশ্যিক পরিবেশগত চালান প্রক্রিয়া ও তার ফলে ঘটে চলা জৈব ভূ-রাসায়নিক অবক্ষয়ের সঙ্গেও যুক্ত।

মার্কসের আশাবাদী দৃষ্টিতে ''মানবজাতি... অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই কাজগুলোই হাতে নেয় যা সে সম্পন্ন করতে পারে, যেহেতু খুঁটিয়ে দেখলে সর্বদা দেখা যাবে যে সমস্যাটা তখনই সামনে আসে যখন তার সমাধানের বস্তুগত শর্তগুলি বিদ্যমান, বা নিদেনপক্ষে তৈরি হয়ে উঠছে।'' আজ আমাদের সময়ের যুগান্তকারী সংকট নিবারণের বস্তুগত সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভাবে বিদ্যমান। এই সম্ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছে শোষণ, বর্জ্য উৎপাদন, অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতা, ব্যবহার-মূল্যের অপসারণ, এবং সত্যিকারের সম্পদের লোলুপ ধ্বংসসাধনের দ্বারা চিহ্নিত বর্তমান ব্যবস্থায়। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের এমন প্রবল অপব্যবহারের অর্থ হলো, মানুষের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটানোর মতো উৎপাদন ও ব্যবহারের সক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা আমরা অর্জন করে ফেলেছি। এখন আমরা বিশ্বজুড়ে সংরক্ষণ অনুশীলন করতে পারি। পারি এমন এক সমাজ সৃষ্টি করতে যা পরিবেশগত ভাবে সক্ষম এবং মূলগতভাবে সমতামূলক।

এসব নিষ্পন্ন করার অর্থ যদিও পুঁজিবাদের প্রসারণবাদী ধারার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা, যা ''মানুষের জন্য নিরাপদ বাসস্থান'' হিসেবে পৃথিবীর মাপকাঠিগুলিকে লঙ্ঘন করে পৃথিবীকে ধ্বংস করছে। এর প্রকাশ ঘটছে জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রের অম্লতাবৃদ্ধি, ওজোন স্তর ধ্বংস, প্রজাতি বিনাশ, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস চক্রের ভাঙন, পানীয় জলের ধ্বংসসাধন, ভূমিক্ষয়, রাসায়নিক দূষণ প্রভৃতি ঘটনায়।

পুঁজিবাদের কাছে সময় হলো অর্থ এবং মানব সমাজের ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তাই অর্থের বেড়াজালে নিয়মিতভাবে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদ অর্থনীতির ব্যবহার-মূল্য কাঠামোটাই বদলে দেয় এবং এমন সব পুঁজিবাদী ব্যবহার-মূল্য তৈরি করে, যার চরিত্র বেশির ভাগ সময়েই নেতিবাচক। কারণ তার লক্ষ্য হল পণ্য চলাচল বাড়ানো, পরিবেশগত চালান বৃদ্ধি করা এবং সব মিলিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ধনীদের জন্য আরও সম্পদ সৃষ্টি করা। পুঁজিবাদের, বিশেষ করে বর্তমান স্তরের একচেটিয়া লগ্নিপুঁজির স্তরে চিন্তা হলো, *আমার সময় শেষ হলে তো মহাপ্রলয়*। তাই বর্তমান যুগান্তকারী সংকটের থেকে উদ্ধার পেতে এক যুগান্তকারী উত্তরণ প্রয়োজন, এক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ভিন্নতর উৎপাদন ব্যবস্থায়; যা আমাদের সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের কথা মনে পড়ায়। কিন্তু বর্তমান উত্তরণ হবে আরও বিশাল। বস্তুত, মেসজারোস-কে উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, আজ দরকার হলো ''মার্কস যেমন বলেছিলেন তেমন বিশ্বব্যাপী, যুগান্তকারী... কাঠামোগত পরিবর্তন।''

কীভাবে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে? আমি নিশ্চিত যে বস্তুগত শক্তিগুলি আজ বেশি বেশি করে কর্মস্থলের শোষণ এবং পরিবেশগত ধ্বংসসাধনের তফাত মুছে ফেলছে— যেহেতু পুঁজিবাদ বিশ্বজুড়েই সমস্ত সত্যিকারের বস্তুগত উৎপাদনের পরিবেশকে ক্ষইয়ে দিচ্ছে। বিশ্বের উত্তরের দেশগুলির তুলনীয় দক্ষিণের দেশগুলিতে এই নাটকীয় পরিবর্তন বেশি দ্রুত ঘটছে। ফলে চীন, ভারত, মিশর, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, এবং এমনকি উত্তর আমেরিকার অংশবিশেষেও আত্মপ্রকাশ করছে [কানাডার অভ্যন্তরীণ 'আর আলস্য নয়' (Idle No More) আন্দোলন], যাকে বলা যায় এক ''পরিবেশবাদী শ্রমিক শ্রেণী''। যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুগত অবস্থায় অবদমিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যাপক জোটবদ্ধতার ফসল। পরিবেশগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইয়ের এই বিস্তার এবং বিভিন্ন ধরনের জোট বাঁধায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম দিকের লড়াইগুলির লক্ষ্য ছিল কারখানার ভেতরের শোষণের পাশাপাশি শ্রমিক বস্তিগুলির দূষিত পরিবেশও। নাওমি ক্লাইন কথিত ''বিধ্বংসী পুঁজিবাদ''-এর ফলে যে ব্যাপক বেসরকারিকরণ ঘটছে তা এক নতুন পরিবেশ-বান্ধবতা তৈরি করছে, যা প্রকৃতি ও সমাজের বিপাক ক্রিয়ার মতোই যা মানবিক উৎপাদনের এক লক্ষ্য তুলে ধরছে।

এই যুগান্তকারী সংকটের কেন্দ্রে রয়েছে প্রাকৃতিক বস্তুগত ব্যবহার-মূল্যের অপব্যবহার। তা রয়েছে উৎপাদনকে যে সংকীর্ণ অর্থে দেখা হয় তার ভিতর, এবং যাকে মার্কস বলেছেন ''প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যেকার বিপাকক্রিয়া'' বা ব্যাপকতর অর্থে, সবথেকে দ্বান্দ্বিক অর্থে মানবিক উৎপাদন, তারও ভেতর। এর দ্বারা প্রতিটি বস্তুগত সম্পর্ক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক-গোষ্ঠীগত, অথবা পরিবেশগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অতএম আমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের দিকে এগোচ্ছি যা আমাদের সময়কার পুঁজিবাদের বিপুল সৃষ্টিশীল ধ্বংসক্ষমতার থেকে উদ্ভূত— যখন এই বিভিন্ন বস্তুগত অবস্থা আর গত শতাব্দীর বেশির ভাগ সময়ের মতো যেমন বিযুক্ত থাকবে না। যদিও শ্রম, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সব ধরনের সংঘাতই ঘটছে শ্রমিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে শ্রমিকদের বিভক্ত করে জয় করতে সচেষ্ট শক্তিগুলির। তাদের নীতি হল ভাগ করো ও জয় করো, যেমনটা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। তবুও বস্তুগতভাবে এমন একটা অবস্থা তৈরি হচ্ছে যাতে চালু ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে আরও বড় বাস্তব একটা জোটের সম্ভাবনা বেড়ে উঠছে। ডেভিড হার্ভে যেমন বলেছিলেন, সম্ভবত তা বহু বিপ্লবী সংগ্রামের সমাহারে অবয়ব নেবে, যাতে লিঙ্গগত, জাতিগত, শ্রেণীগত, স্থানিক এবং পরিবেশবাদী আন্দোলন-গুলির জোটবদ্ধ ঘটবে।

এ সব কিছুই অবশ্য নির্ভর করছে একটি পরিবেশবাদী শ্রমিকশ্রেণীর (এবং পরিবেশবাদী কৃষকশ্রেণীর) প্রবল হয়ে ওঠার ওপর, যারা এক প্রবল, আধিপত্য-বিরোধী লড়াই শুরু করতে সক্ষম, যাতে পৃথিবীর মূল জৈব ভূ-রাসায়সিক প্রক্রিয়াগুলি অনুসারে মানবসমাজের চাহিদাগুলি পূর্ণ হয়। তৈরী হয় এমন এক জগৎ যা সমতাপূর্ণ এবং পরিবেশগতভাবে টিকে থাকতে সক্ষম। কোন সন্দেহ নেই যে এটি এক বস্তুগত প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে সব মানুষই এ-প্রয়োজন অনুভব করবেন। তবুও মানবের ভবিষ্যতের কোন স্থিরতা নেই। মানুষ জাতি ও তার সঙ্গে আরও কিছু উচ্চতর প্রজাতির জীবন আজ বিপন্ন। মানব জাতির অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ তাই আজ মানবজাতির বিপ্লবী সংগ্রামের উপর নির্ভর করছে, যেমনটা আগে কখনও নির্ভর করেনি।

অ্যানালিটিক্যাল মান্থলি রিভিউ, অক্টোবর ২০১৩ থেকে গৃহীত

স্ম র ণ

''বিদেশি বিনিয়োগ নির্ভর অর্থনীতি দিয়ে খাদ্যসমস্যা কেন, কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়।''

উপরের কথাগুলি সদ্যপ্রয়াত **অভী দত্ত মজুমদারের**।

তরুণ কৃতি বৈজ্ঞানিক অভী এই শতকের প্রথম দিকে বিদেশ থেকে ফিরে বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি শুরু করেন সামাজিক কাজকর্ম। সেখান থেকে আসেন রাজনৈতিক কার্যকলাপে। ২০০৬ সালে অভী প্রথমে অপ-উন্নয়নের বিরুদ্ধে সমমনস্ক বিজ্ঞানী ও শিক্ষকদের নিয়ে সংগঠন গড়েন— 'TASAM'। এর পরে গড়ে তোলেন একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ বা 'FAMA'। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বের সংগ্রামে এই সাথীকে আমরা সব সময় পাশে পেয়েছি। তাঁর লেখা আমরা বারবার *অনীক* পত্রিকায় প্রকাশ করেছি। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসানে ব্যথিত *অনীক* তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

গ্রন্থ আলোচনা

আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা

হৈমন্তী রায়

'নারীর চোখে নারী' বইটিতে লেখক এষা বসু একটি নির্দিষ্ট সময়কে বেছে নিয়েছেন, অর্থাৎ ১৮৫৬ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। এই পর্বে নারী লেখকরা কী দৃষ্টিতে অপর নারীকে দেখতেন, বুঝতেন, তাঁরা তাঁদের লেখায় নারী সমাজের কষ্ট যন্ত্রণাকে কী ভাষায় রূপ দিয়েছেন— সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁদের লেখায় উঠে এসেছে নারীর লাঞ্ছনা ও নির্যাতন। নারী চিরকালই পুরুষের পদানত। কিন্তু সুযোগ পেলে নারীও যে সব কাজেই পারদর্শিতা দেখাতে পারে, তা পুরুষ সমাজ কখনও বিশ্বাস করেনি। ভাবতে অবাক লাগে যখন দার্শনিক রুশো নারী সম্বন্ধে বলেন, নারী দরকারি অশুভ। *The Decline of the West* গ্রন্থের লেখক অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার নারীকে ইতিহাস এবং পুরুষকে সেই ইতিহাসের নির্মাতা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই নারীদের যে স্বকীয় চিন্তাভাবনা থাকতে পারে, বা তাঁরা মনের ভাবকে লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, এ বিষয়েও পুরুষদের মনে তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পায়। আর সকলের কথা ছেড়ে দিলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ— যিনি নারীজাতির প্রগতি, গৃহে ও সমাজে নারীর স্বাধীনতা চেয়েছেন, তিনি যখন বলেন— মেয়েদের ধারণাশক্তি থাকলেও সৃজন শক্তি নেই, তখন মনে হয় এ হলো দেশকাল-নিরপেক্ষ পুরুষতন্ত্রের লিঙ্গ রাজনীতি।

নারী লেখকদের লেখার আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের লেখক এষা প্রথমেই কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' বাঙালি নারী রচিত প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। 'চিত্তবিলাসিনী' সেকালের অন্তঃপুর শিক্ষার প্রথম ফসল। এই প্রসঙ্গে একটু সংযোজনের লোভ সামলাতে পারছি না। এই গ্রন্থটির আরও একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। ১৮৫৯-এ আধুনিক বঙ্গমহিলা রচিত গ্রন্থের সমকালীন সমালোচনার শীর্ষস্থানে দেখা যায় 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যগ্রন্থটিকে। এটি সেই হিসাবে মেয়েদের প্রথম বাংলা সমালোচিত গ্রন্থও বটে।

লেখকের কলমে একে একে এসেছে কোচবিহারের মহারাণী বৃন্দেশ্বরী রচিত 'বেহারেদস্ত'— কোচবিহারের ইতিহাসে যা একটি অত্যন্ত পুরাতন গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। বামাসুন্দরী দেবীর প্রবন্ধ বাংলার দ্বিতীয় মুদ্রিত রচনা। কী কী *কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে* সোমপ্রকাশ পত্রিকায় ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সমাজ যে পিতৃতান্ত্রিক ভাবনায় ভাবিত ছিল, পুরুষ সমাজ নারীকে যেভাবে চাইত তারই প্রতিচ্ছবি বামাসুন্দরী লেখায় পাওয়া যায়। কৈলাসবাসিনী দেবীর রচনা সম্পর্কে লেখক সঠিকভাবেই বলেছেন, "কৈলাসবাসিনী দেবী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিক্ষালাভ করেছেন এবং নারী বিষয়ে উন্নত চিন্তাভাবনা করে পুস্তক রচনা করেছেন এটিই আমাদের অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।" বাংলার নারী লেখক রচিত সাহিত্যের আলোচনায় লেখক প্রসঙ্গক্রমে যাঁদের আলোচনা এনেছেন মুসলিম লেখিকা তাহেরুন্নেসা অন্যতম। মুসলিম সমাজে অবস্থান করেও তাঁর চিন্তা ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল।

বাঙালি লেখিকাদের মধ্যে রাসসুন্দরী দাসীর স্থান অগ্রগণ্য। তাঁর 'আমার জীবন' নামে আত্মচরিত বাংলায় প্রথম আত্মজীবনী। বাংলাভাষায় রচিত প্রথম এই আত্মজীবনীতে মেয়েদের সে-সময়কার জীবনধারার একটি দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। বইটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। "লোকে আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি এ পিঞ্জরে বন্ধ এ জন্মের মত বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই।।" লেখক রাসসুন্দরী দাসীর সঙ্গে অন্য বাঙালি বিবাহিত নারীদের সাদৃশ্য পেয়েছেন। তাঁর কথায়— "এই বই আজ পর্যন্ত যত বিবাহিত বঙ্গনারী পড়েছেন তার মধ্যে এমন একজনও সম্ভবত নেই যিনি এই স্থানে এসে নিজের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেননি।"

মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকায় মায়াসুন্দরী লিখেছিলেন— "আমরা কি কুক্ষণেই নারী হইয়া এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ..... আমাদের জন্মাবধি পোড়া কপাল" অর্থাৎ মেয়ে-জন্ম যে সত্যিই অপমানিত লাঞ্ছিত এক জীবন— সেই দীর্ঘশ্বাস প্রায় সব লেখাতেই এসেছে। লেখকের মতে মায়াসুন্দরী তাঁর লেখায় নারীর স্বাধীনতার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন। এভাবেই এসেছে বজ্রবালা দেবীর কথা, যিনি বিধবার দুঃখে কাতর হয়ে স্পষ্ট ভাষায় দেশাচারকে পুড়ে মরতে বলেছেন এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। তাঁর কবিতার মাধ্যমে তিনি বিধবার দুঃখে কাতর হননি, বরং বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন। কামনা দেবীর লেখায় অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যাওয়ায় তাঁর জীবন যে শূন্য হয়ে গেছে, সেই দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহেও কুলাচার তাঁকে টানছে। "দ্বিতীয়বার বিবাহ তাঁর কাছে গণিকাবৃত্ত তুল্য। এক্ষেত্রে তিনি সমাজের প্রচলিত ভাবনা দ্বারা ভাবিত হয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত সমস্ত বিয়েই গণিকাবৃত্তি— কারণ খাওয়া,

পরা, বাসস্থান চিকিৎসা ইত্যাদির বিনিময়ে স্ত্রী স্থায়ীভাবে তার স্বামীকে শরীর দেয়। অর্থাৎ বিবাহের মধ্য দিয়ে পারিবারিক একটি বন্ধনের আড়ালে সারা জীবনের দাসীবৃত্তি। লেখক এখানে খুব সঙ্গতভাবেই এঙ্গেলসের পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি লেখাটির কথা বলেছেন। এঙ্গেলসের ভাষায়— মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়।

১২৯০ বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গমহিলা' একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে ভবানীপুরের মহিলারা এই কবিতাটি তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে প্রকাশ করেন।

এ বিলাপ কভু দেবী সাজে কি তোমায়?
বিষাদে বিষন্নমুখ কি লাগি তোমায়?...
স্থাপিল তোমার স্বামী, লভিলা আপনি
অক্ষয় অনন্ত কীর্তি যশঃ বিমন্ডিত

এক নারীর পাশে অন্য নারীরা দাঁড়িয়েছেন এবং বৃহৎ জগতের আহ্বানে তাঁরাও উদ্বেলিত হয়েছেন।

'নারীর চোখে নারী'র আলোচনায় এসেছে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং 'ভারতী' পত্রিকা প্রসঙ্গ। 'ভারতী'-র ১২৯০ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'সমাজ ও কুসংস্কার নামে রচনাটি প্রকাশিত হয়। তিনি বঙ্গমহিলা সভায় এটি পাঠ করেছিলেন। সমাজ সংস্কারের নামে দেশীয় প্রথাকে বর্জন করা এবং নানা ধরনের ইংরাজি প্রথার প্রচলনের বিরোধী ছিলেন তিনি। লেখিকার সংস্কারের প্রতি সমর্থন ছিল, কিন্তু কিছু চিন্তা না করে অন্ধভাবে ইংরেজদের নকল করার প্রবণতার বিরোধী ছিলেন তিনি। লেখকের মতে, "আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই নকল নবিশী এখনও চলছে।"

কৃষ্ণভামিনী দাস প্রায় বিপ্লবাত্মক একটি কাজ করেছিলেন। সে যুগে তিনি অন্তপুরের অবরোধ ভেঙ্গে বিলাত ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সের নারী সম্পর্কে তাঁর অভিমত— "স্ত্রীলোকেরা অতিশয় নম্র ও লজ্জাশীলা, ইহারা বাবু নহে, গরীব স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সঙ্গে সমান কাজ করে, লাঙ্গল বহে জল টানে— এইরূপ অনেক শক্ত কাজে স্বামীর সাহায্য করে।" তিনি ইংলন্ডের মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করায় মুগ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু দেশের মেয়েদের কথা স্মরণ করে তিনি দুঃখও পেয়েছিলেন। কারণ স্বাধীনতার যে আনন্দ, ভারতীয় মহিলারা তা থেকে বঞ্চিত। তাঁর আর একটি পর্যবেক্ষণ— "সকল দেশেই দেখিতে পাই, স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা ধর্ম্মকাব্য ও পূজা আশ্রয়ে বেশি রত এবং সকল দেশেই স্ত্রীরা অধিক গোঁড়া।" লেখকের মন্তব্য, "তাঁর পর্যবেক্ষণ যথার্থই কিন্তু যে বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ দরকার ছিল তা তিনি করেননি, করা সম্ভবও ছিল না। ধর্মের ইতিহাস সর্বদাই নারীকে অবদমিত করেছে। গোঁড়া রাখতে পারলে সমাজের সুবিধা শাসনযন্ত্রের সুবিধা, তাই শাসক শ্রেণী ও ধর্ম নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নারীকে ধর্মের বাঁধনে বেঁধে রাখার জন্য।" যে কোন যুক্তিবাদী মানুষই একই কথা বলবেন। তার কৃষ্ণভামিনী লেখা সম্পর্কে কিছু স্ববিরোধ রয়েছে। যেমন তাঁর মনে হয়েছে নারীরই সতীত্ব প্রধান ধর্ম। লেখকের মতে, "কিন্তু এটি যে স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম নয়, এটি সমাজ নারীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে নারীকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে দেখে এবং উদ্বৃত্ত সম্পদ জমা করে উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে যাওয়ার জন্য তা তিনি ভাবতে পারেননি এবং সেটাই স্বাভাবিক আর আমরাও পারতাম না এঙ্গেলস না ভাবলে।"

স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনায় যে বৈশিষ্ট্য, যে বোধ, তা আমাদের মুগ্ধ করে। গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর মৃত্যুর পর স্বর্ণকুমারী ভারতী পত্রিকায় তাঁর স্মরণে একটি রচনা প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি লিখেছেন— "কবি গিরীন্দ্র মোহিনীর সহিত আমার মিলন পাতানো ছিল।" এই প্রসঙ্গে লিখেছেন — "এক নারীর চোখে অপর নারী কি সখ্য, প্রীতি, সম্মান ও শ্রদ্ধার জোরে বাঁধা ছিল তা দৃষ্ট হয়।" স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পর্কে লেখক আরও লিখছেন যে "স্বর্ণকুমারী দেবী যদিও ঠাট্টাচ্ছলে বলেছেন ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে নারীই প্রধান ভূমিকা নেবে, পুরুষ বুদ্ধিবলে নারীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না," কিন্তু একশ বছর পরেও পুরুষ সুযোগ পেলেই নারীকে বঞ্চিত করে। লেখকের মন্তব্য— "এর পেছনে তবে কি পুরুষের সত্যই সেই ভীতি রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন হলে পিতৃতন্ত্র অস্তিত্বের সংকটে পড়বে?"

পণ্ডিতা রমা সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবী উচ্ছ্বসিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রের এই অসামান্য নারী সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন, দেশভ্রমণের পথে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু দুঃখ অনুভব করেছেন দেশের অজস্র মেয়ের বন্দীদশা স্মরণ করে।

দেখা যাচ্ছে 'উনিশ শতকে' বাঙ্গালী লেখিকা বা কবির অভাব হয়নি, বঙ্গসাহিত্যকে তাঁরা নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক প্রসন্নময়ী দেবী, কুসুম কুমারী দেবী, সারদা সুন্দরী দেবী, অন্নদাময়ী দেবীর কথা লিখেছেন। এঁদের লেখা কখনো প্রচলিত ধ্যানধারণার সপক্ষে গেছে, আবার কখনও বা কিছু বিপরীত সুরও শোনা গেছে।

গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর লেখা পড়ে আমরা চমৎকৃত হই। তিনি লিখেছেন — নারী-পুরুষ সমান হলে "পরস্পরের আদান প্রদানে যে সুখ, একের নিকট হইতে অপরের গায়ের জোরে কাড়িয়া লওয়া বা ভিক্ষা করিয়া চাহিয়া লওয়ায় সে সুখ পাওয়া যায় না। পরস্পরের প্রীতি ও মৈত্রী প্রভৃতির স্থলেই যথার্থই আদানপ্রদান হইয়া থাকে।" ১৮৯৪ সালে এই লেখার মধ্য দিয়ে আমরা পেয়ে যাই তাঁর সাম্যবাদী ভাবনার।

কবি কামিনী রায় সম্বন্ধে লেখক যা মূল্যায়ন করেছেন তা যথার্থ। তাঁর ভাষায়, "কামিনী রায় প্রথম যুগের কবিদের মধ্যে অন্যতম সেরা। তিনি যে শুধু কবিতা রচনা করেছেন তাই নয়

গদ্য রচনাও করেছেন এবং প্রধানত গদ্যে তাঁর সমাজ ভাবনা বা নারী বিষয়ক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ— বরপণ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন— ''একটা নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথার যে দাসত্ব করা হইতেছে... সে জন্য কিছুমাত্র লজ্জাবোধ নাই।'' তিনি আরও লিখেছেন— ''যে বাজারে দাসদাসী বিক্রয় হয় সেখানে মূল্যটি দিতে হয় দাস কিংবা দাসীর জন্য; কিন্তু বিবাহের বাজারে মূল্যে কিনিতে হয় মনিব।'' তীব্র শ্লেষের সঙ্গে তিনি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। দুঃখের বিষয় যে এ প্রথা আমাদের সমাজে আজও জগদ্দল পাথরের মত চেপে রয়েছে।

মানকুমারী বসু তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ গ্রন্থটিতে নারীর সামাজিক অবস্থান তুলে ধরেছেন। এখানে নারীর দৃষ্টিতেই তিনি নারীকে দেখেছেন।

রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেন এক মুসলিম পরিবারের জন্মে এবং মুসলিম পরিবারের বধূ হয়েও এক সচেতন মুক্তমনা মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। রোকেয়াই প্রথম বাংলাভাষায় আন্দোলনের আহ্বান জানালেন মেয়েদের উদ্দেশে। নারীবাদের বলিষ্ঠ প্রকাশ, ধারালো যুক্তি, সেই-প্রবাদ-প্রবচন সমেত মেয়েলি কথ্যভাষার সৌন্দর্য— রোকেয়ার যুক্তিমূলক গদ্যকে অনন্য করে তুলেছে। যে রোকেয়া পুরুষতন্ত্রের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন, সেই রোকেয়াই আবার বোরখার উপযোগিতা এবং বোরখার ব্যবহারে জয়গান গেয়েছেন। এখানে তাঁর স্ববিরোধিতা বোঝা যায়। তাহলেও রোকেয়ার লেখার মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, লেখক তাঁর চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন।

'ভারত মহিলা' পত্রিকায় 'মাতৃভূমির দুর্দ্দিনে মহিলাগণের কর্তব্য' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়, লেখিকার নাম কুমুদিনী মিত্র। সেই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তুঙ্গে। কুমুদিনী মিত্র সেই আন্দোলনে নারীদের যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন— ''স্বদেশের জন্যই এই যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহার উত্তাপ কি নারীজাতিকে স্পর্শ করিতেছে না? স্বদেশে ভক্তগণ মাতৃভূমির নামে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, নারীগণের কি তাহা পালনীয় নহে? দেশের এই দুর্দ্দিনে নারীগণ যদি পুরুষের সহিত সম্মিলিত না হন তবে আর আশা কোথায়?'' তিনি চেয়েছিলেন বৃহত্তর ক্ষেত্রেও মেয়েরা এগিয়ে আসুক। লেখকের মতে, ''কুমুদিনী নারীকে সেই বৃহত্তর কাজের মধ্যে ডেকে নিয়েছেন, এতে তাঁর নারীর সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই প্রকাশ পায়।''

'ভারত মহিলা' পত্রিকাতে রঙ্গামার বক্তৃতায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়, রঙ্গামা মহীশূরে জন্মেছিলেন, অল্প বয়সে বিধবা হন। পরবর্তীকালে শিক্ষালাভ করেন এবং দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ''পুরুষ এবং স্ত্রী জাতি উভয়েই শিক্ষার প্রয়োজন আছে।''

এছাড়া 'ভারত' প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি নারীকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ ছাড়া 'ভারত মহিলা পত্রিকায় ভারত নারীর শিক্ষা প্রসঙ্গে সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশিত হয় তাতে তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত জোর দিয়েছেন।

সৌদামিনী দেবীর স্মৃতিকথায় ঠাকুবাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। কীভাবে ধীরে ধীরে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়াও পোষাকের ব্যাপারে তাঁরা বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটান। সৌদামিনী দেবী লিখেছেন— ''আমরা যখন সেমিজ জামা জুতো মোজা পরিয়া গাড়ী চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম তখন চারিদিক হতে যে কিরূপ ধিক্কার উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নহে।'' লেখকের মতে, ''এখানে সেই সময়কার নারীর অবস্থানের কিছু কিছু চিত্র পাওয়া যায়।''

লেখক এষা বসু এবার তাঁর লেখনীতে এমন একজন নারীর সম্বন্ধে লিখেছেন যে বিনোদিনী দাসী ছিলেন নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়ে। কিন্তু কেবল অধ্যাবসায়, মনোবল, নিষ্ঠা, আর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তিনি চারপাশের সব মলিনতা, ক্ষুদ্রতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী ''আমার কথা' বইটিতে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন— ''আমি জগৎ মাঝে কলঙ্কিনী পতিতা, আমি ঘৃণিতা, বারনারী।'' লেখকের মতে— ''বঙ্গদেশে বিনোদিনীর মত সৎ সাহসী রচনাকার দ্বিতীয় নেই।'' এ বিষয়ে আমরা পাঠকরা একমত। লেখক আরো বলেছেন— ''তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে সেই যুদ্ধ তখনকার নাট্যজগত এবং সমাজে বারাঙ্গনা নারীদের অবস্থান বিষয়ে জানা যায়।''

হেমলতা সরকার তাঁর পিতা, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি সেযুগের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থটি শিবনাথ নিয়ে লেখা হলেও তাঁকে কেন্দ্র করে যে সব নারীরা ছিলেন হেমলতা তাঁদের নিয়েই লিখেছেন। তিনি লিখেছেন— ''শিবনাথের জননী গোলকমণি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সুগৃহিনী ও অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন।'' তবে হেমলতা দেবী তাঁর মা প্রসন্নময়ী সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ছিলেন, কারণ সেই সময় এই ধরনের ব্যক্তিত্ব কমই দেখা যেত। হেমলতা দেবী লিখছেন যে শিবনাথ শাস্ত্রী পত্নী প্রসন্নময়ী দেবীকে কলকাতায় তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুদের কাছে নিয়ে আসেন। ''কিন্তু চেষ্টা প্রসন্নময়ীর নিকট অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা হইল। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের বউ, আজন্ম বিশেষ শুচিতা শিক্ষা করিয়াছেন।'' কিন্তু পরবর্তী কালে প্রসন্নময়ী দেবী আচার বিচার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রভাবে তিনিও মহৎ ভাবের অধিকারিণী হয়েছিলেন। যিনি বিবাহের সমস্ত রন্ধন করেছিলেন, কিন্তু সেই বিবাহ সভায় ত্রিসীমায় যান নি, হেমলতা দেবী লিখছেন— তিনিই— সেই প্রসন্নময়ী নিজে উদ্যোগী হইয়া কত বালবিধবাকে সন্তানের মত প্রতিপালন করেছেন। এমনকী একটি মেয়েকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, যে ছিল পতিতার কন্যা। কিন্তু তাঁকেও তিনি কন্যা ''নির্বিশেষে

প্রতিপালন করিয়াছিলেন''। তাঁর এই ঔদার্য আমাদের মুগ্ধ করে। লেখকের মতে — ''বহু আকাঙ্ক্ষিত সমাজ গড়বার যে বৈপ্লবিক ভাবনা সে সময়কার রাশিয়ায় চলছে তার অনেক আগেই প্রসন্নময়ী দেবী কোন তত্ত্ব ছাড়াই শুধু হৃদয়ের ভালবাসা ও সেবার মনোভাব দিয়ে সেই স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন।''

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রচুর গল্প উপন্যাস লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। এই সমাজে নারীর স্থান কোথায় তার একটি সম্পূর্ণ চিত্র আমরা তাঁর রচনায় পাই। লেখক এষা বসু, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রসঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন— ''তিনি লিখে উপার্জন করতেন বা করতে হত— তাঁর মানসিক রোগগ্রস্ত স্বামীর চিকিৎসার জন্য এবং সংসার চালানোর জন্য। অর্থাৎ নারীকে বর্হিজগতে যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল।''

প্রফুল্লময়ী দেবীর আমাদের কথা রচনাটি ১৩৩৭ বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর একমাত্র রচনা। জোঁড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের বধূ হিসাবে অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী হয়ে তাঁর আগমন। নারীর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর মতামত সুচিন্তিত। তাঁর মতে মায়ের কাছেই যে শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারটি নির্ভর করে। তাই তিনি লিখেছেন— ''মাতা যদি সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে সক্ষম না হয় তার সে সংসার সুখের হয় না।'' শ্বশুর বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল। তিনি লিখেছেন— ''বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া ননদ জা ও আত্মীয় স্বজনদের নিকট হইতে এত আদর যত্ন পাই যে তাহাতেই অনেকটা বাপমায়ের শোকটা ভুলিতে পারিয়াছিলাম।'' মেজ জা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রশংসা করেছেন তিনি, যিনি দুঃখের সময় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। শাশুড়ি সম্বন্ধে তিনি উচ্ছ্বসিত তিনি লিখেছেন— ''শাশুড়ীর মত শাশুড়ী পাইয়াছিলাম, তাঁর মত সৌভাগ্যবতী, পতিভক্তি পরায়ণা স্ত্রীলোক এখনকার দিনে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।'' এমনকি ''তাহার সৌভাগ্যের জোরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যবসা বাণিজ্য যথেষ্ট হইয়াছিল। শাশুড়ীর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, তাহারই জন্য তাঁহার শ্বশুর খুশী হইয়া তাঁহাকে এক লক্ষ টাকার হীরা পান্না মোতি বসানো খেলনা কিনিয়া দিয়াছিলেন।'' কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও আছে। অসময়ে সন্তান মারা যাওয়াতে এবং স্বামী উন্মাদ হওয়ার জন্য তিনি বিষয় থেকে বঞ্চিত হন। অর্থকষ্ট তাঁকে সারাজীবনেই ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। তাই লেখক এখানে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে লিখেছেন — ''...ভাগ্য ফিরল এই বিশ্বাসে বধূর জন্য লক্ষ টাকার খেলনা কিনতে দ্বিধা নেই কিন্তু বাড়ির পুত্রবধূ-প্রপৌত্র বধূদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে কিছুমাত্র আটকায় না মানবিকতায়। সেই যুগের সমাজ চিত্র— নারীর অবস্থান এবং মহৎ পরিবারের মহত্ত্ব সবই একসাথে গিয়ে যাই।''

আশালতা সিংহ উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। লেখকের ভাষায়— আশালতা ছিলেন ব্যতিক্রমী,'' লেখকের মন্তব্য— ''আমরা আগে বিভিন্ন লেখিকার রচনা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং দেখেছি তাঁদের লেখায় যে মত প্রকাশ পেত সমাজ স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তা বেশিরভাগই সেকালের পুরুষের মত, তাই তাঁদের লেখা সম্পর্কে পুরুষদের বাহবা দিতে বাধেনি। এইখানে আশালতা ব্যতিক্রম, ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি সমাজ বা গৃহের পুরুষের মতকে অগ্রাহ্য করে নিজের অনুভূতি আবেগ বা বিচার দ্বারা গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন।''

জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'একশাখী পরে' 'দেশ পত্রিকায় ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই রচনার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নতুন রকম। তিনি লিখেছেন— ''মায়ের পূজার মণ্ডপে শুধু দর্শক হিসাবে যেদিন নারী রাজী হলেন না, সেদিন ভারতের নারী এই পূজাক্ষেত্রে পূজারিনী হিসাবে সমান অধিকার দাবী করলেন। জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে উপস্থিত দশটি নারীর মধ্যে চারটি নারী ডেলিগেট হিসাবে সমান আসন অধিকার করলেন।'' লেখকের ভাষায়— ''নারীর সমাজের বৃহত্তর আঙিনায় প্রবেশের কথা বলেছেন গর্বের সঙ্গে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ যে সামাজিক প্রগতির অঙ্গ তাও বলেছেন।''

জ্যোতির্ময়ী দেবী সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এষা লিখেছেন— ''লেখিকার মনে প্রেম সম্বন্ধে যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে সমাজের সেখানে পৌঁছাতে এখনও অনেক দেরী।''

লেখক আলোচনা প্রসঙ্গে 'দীপাবলী' পত্রিকার কথা উল্লেখ করেছেন। দীপালী পত্রিকায় নারীলোক বলে একটি বিভাগ ছিল, হিরন্ময়ী দেবী তা পরিচালনা করতেন। এই পত্রিকায় মেয়েরাই নানা বিষয়ে চিঠি লিখতেন যা সেই সময় হিসাবে বেশ সাহসী। লেখকের মতে— ''বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একটি পত্রিকায় সে সময়ে মেয়েদের সমস্যা বা দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং সাধারণ পাঠিকারা তাতে অংশগ্রহণ করেছেন এটি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ।''

প্রসন্নময়ী দেবীর কথা লিখতে গিয়ে লেখক লিখেছেন— ''প্রসন্নময়ী দেবী তার স্মৃতিকথা রচনা করেন 'পূর্ব্বকথা' নাম দিয়ে, যা সেই সময়ের সমাজ জীবনের দলিল। প্রসন্নদেবী লিখেছেন সেই সময়ে কন্যা জন্মগ্রহণ করলে সকলেই অসন্তুষ্ট হতেন, এবং বাড়ীতে কান্নাকাটি পরে যেত। কিন্তু আজও কি এই মানসিকতার অবসান হয়েছে? লেখক জানাচ্ছেন, ''রাষ্ট্রসংঘ বলছে— কন্যা শিশুর পক্ষে ভারত একটি জঘন্যতম স্থান।''

হেমলতা ঠাকুর 'মনের ছবি' বলে একটি ছোট লেখা লিখেছিলেন, যা 'সমকালীন'-এ প্রকাশিত হয়। ১৩৪৬-এ তিনি

শান্তিনিকেতনে গেছিলেন এবং সেখানে তিনি ছোটোদের লেখাপড়া শিখাতেন, এবং এই কাজটি তিনি খুব আনন্দ সহকারে করতেন। এবং তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করে প্রভাময়ী পরবর্তীকালে স্কুলে চাকরি পেয়েছিলেন। লেখক তাই মন্তব্য করেছেন— ''এই লেখা যদিও অনেক পরবর্তীকালে তবে তার মধ্যে সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মেয়েদের বাইরে বেরনো বা চাকরি করা লজ্জার তো নয়ই উপরন্তু 'গৌরবের'।''

আমোদিনী দাশগুপ্তের লেখা সম্বন্ধে এষা লিখছেন— ''নারীর বিদ্যাহীনতা, বাল্যবিবাহ, অসম বয়সী বিবাহ, পুরুষের কন্যাপণ ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রকাশ পেয়েছে।''

সরলা দেবী 'দেশ' পত্রিকায় 'জীবনের ঝরাপাতা' লেখাটি লেখেন। তাঁর লেখায় আমরা পেয়ে যাই সে সময়কার নারীদের কথা, বিশেষত ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা যাঁরা মেয়েদের পোষাক থেকে আরম্ভ করে মহিলাদের শিক্ষিত করা এবং জীবিকা অর্জনের জন্য তৈরি করা— সে সমস্ত দায়ীত্বই নিয়েছিলেন। তিনি নিজেও মহীশূর রাজ্যের মহারাণী গার্লস স্কুলে পড়িয়েছেন— ''ভাইদের মত স্বাধীন জীবিকা অর্জনের জন্য।'' মেয়েদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু সেখানেও ছিল পুরুষতন্ত্রের ছায়াপাত। যা আজও সমানভাবেই প্রযোজ্য। লেখক প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন— ''লাখ কথার এক কথা যতই যোগ্যতা হোক রাজনীতিতে মেয়েদের স্থান দিতে পুরুষ নারাজ।'' কিন্তু এ হেন সরলাদেবীর মতে, পুরুষ বহুগামী হলেও হয় কিন্তু নারীকে একগামী হতে হবে। এটি তার স্ববিরোধিতা। এ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর অন্যান্য মতগুলি মেলে না।

সাবিত্রী রায় সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক লিখেছেন— ''সমাজে যে নারীর নিম্ন অবস্থান তা সাবিত্রী দেবীকে ব্যথিত করেছিল এবং তিনি বিভিন্ন গল্পে এই অবস্থানের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

বীনা দাস রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলী লেখায় স্থান পেয়েছে। আবার সেই সঙ্গে মেয়েদের সমাজে কী স্থান সে সম্বন্ধেও চিন্তাভাবনা করেছেন। লেখকের বক্তব্য— ''বীণা তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টির জন্য সাধারণ মেয়েদের দুঃখের এবং মহত্ত্বের দিকটি বুঝতে পেরেছিলেন।''

সুবর্ণপ্রভা দাস তাঁর জীবনের কথা 'দিনলিপি'তে লিখে গেছেন। সুবর্ণপ্রভার দিনলিপি থেকে লেখক উদ্ধৃত করেছেন— ''সংসার কার তা আজ বুঝতে পারছি, সংসারের যুপকাষ্ঠে মেয়েরা অবশ্যম্ভাবী বলি...।'' কিন্তু তিনি বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করেছেন, লেখকের ভাষায়— ''সারা বাংলা জুড়ে যে সময় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' হয় তখন শিলং-এ তা গড়ে তোলায় সুবর্ণপ্রভা এবং সুষমা রায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন''। লেখকের মতে, ''...তাঁর নারী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং কাজকর্ম সক্রিয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।''

আশা দেবীর 'মেঘলা প্রহর' উপন্যাসে কিছুটা জটিল মনস্তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। এটি ১৯৫৫ সালের উপন্যাস।

অর্থাৎ, ''১৮৫৬ থেকে বাঙ্গালী নারী লেখকদের যে যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বাঙ্গালী মেয়ের রচনার ক্রমবিকাশের একটি শতাব্দী ব্যাপী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা পরিক্রমা করলাম।'' লেখকের এই মন্তব্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। যদিও মহিলা লেখকদের লেখায় বিষয়বস্তুতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, যুগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লেখায় তার ছাপ পড়েছে, কিন্তু বাঙ্গালী নারী লেখকের এই শতাব্দী ব্যাপী সাহিত্য সাধনা বাংলা সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে প্রাণিত করেছে।

'নারীর চোখে নারী' বইটির জন্য লেখক এষা বসুকে ধন্যবাদ। অত্যন্ত পরিশ্রমের ফসল এই বইটি। ১৮৫৬ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই একশ বছরের নারী লেখকদের নিয়ে যে কালপরিক্রমা তিনি করেছেন, তা অসাধারণ। 'নারীর চোখে নারী' পড়তে পড়তে আমরা অজান্তেই সেইসব লেখিকাদের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে যাই। তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করি। কত কঠিন বাধা তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে তার পরিচয়ও আমরা পেয়ে যাই এ বইটির মাধ্যমে। বইটির মূল ভাবনা নিজেকে দেখা, চেনা বোঝা, আর এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অপর নারীকে দেখা।

লেখকের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। একজন নারী হিসাবে তাঁর লেখায় তিনি সেইসব নারী লেখকদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সমাজের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা বাড়ল। অহল্যা প্রকাশনী-কে ধন্যবাদ এই বইটি প্রকাশ করার জন্য। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁরা আরও এই ধরনের বই প্রকাশ করবেন। সবশেষে বলি, বইটির মান অনুযায়ী প্রচ্ছদ দুর্বল। বইটির প্রচ্ছদ এবং বাঁধাই আর একটু মনোযোগ দাবি করে।

*** 'নারীর চোখে নারী', এষা বসু। অহল্যা প্রকাশন। মূল্য : আশি টাকা**

দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণ

দীপংকর চক্রবর্তী-র প্রথম প্রয়াণ দিবসে অনীক ও শুভানুধ্যায়ীদের ঘরোয়া স্মৃতিচারণ, আলোচনা

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হল (কফি হাউসের তিন তলা)
২৭ জানুয়ারি, ২০১৪, বিকেল ৫টা

দীপংকর চক্রবর্তী প্রথম স্মারক বক্তৃতা
বক্তা : আনু মুহম্মদ, স্থান : ভারত সভা হল
১লা মার্চ, ২০১৪, বিকেল ৪টা